
অশোকের
রাষ্ট্রসাম্রাজ্য ও ধর্মসাম্রাজ্য
রাষ্ট্র সাম্রাজ্য —
ধর্ম সাম্রাজ্য —
কৃষ্ণ সাগর
মাকিদন
এসিয়া মাইনর
আসীরিয়া
ভূমধ্যসাগর
চীনবর্ষ
পশ্চিম সাগর
পূর্ব সাগর
সুবর্ণভূমি

ধর্ম্মবিজয়ী অশোক

এই লেখকের

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

ধর্মবিজয়ী অশোক

প্রবোধচন্দ্র সেন এম-এ
বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ-অধ্যাপক,
বিশ্বভারতী





পূর্বাশা লিমিটেড
পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা

তিন টাকা

প্রথম প্রকাশ
১ বৈশাখ ১৩৫৪

প্রকাশক ও মুদ্রাকর : সত্যপ্রসন্ন দত্ত
পূর্বাশা লিঃ, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা

আধুনিক যুগের

অহিংসাব্রত ধর্মবিজেতা

মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ধর্মবিজয়ী অশোক



সারনাথ স্তম্ভশীর্ষ

প্রস্তাবনা

বিশ্বভারতীর কৃতী অধ্যাপক শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র একদিন না একদিন ধর্মবিজয়ী অশোক সম্বন্ধে মননযোগ্য বই লিখবেন পূর্ব থেকেই জানতাম। সেদিন থেকে জানতাম যেদিন তিনি স্থানীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে আমার ক্লাসে দেবানাংপ্রিয় অশোকের উৎকীর্ণ লিপিসমূহ বিচক্ষণতা ও নিষ্ঠার সহিত পড়তে আসেন। আজও বেশ মনে পড়ে প্রবোধচন্দ্রের পরিপৃচ্ছা, জিজ্ঞাসা ও সুতীক্ষ্ণ তর্কবিতর্কের ফলে আমার অনুশাসনের ক্লাসগুলি কেমন জমে উঠত। কলিঙ্গাধিপতি চেতকুলতিলক প্রজারঞ্জক সর্বপাষণ্ডপূজক ও সর্বদেবায়তনসংস্কারক খারবেলের হাথিগুম্ফা-প্রশস্তিও প্রবোধচন্দ্র আমার নিকট অধ্যয়ন করেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য হয়ে আছে।

আগের থেকেই বাংলাভাষায় প্রবন্ধাদি লেখা প্রবোধচন্দ্রের অভিপ্রায় ও উচ্চাভিলাষ ছিল। এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর পূর্ব সংকল্প বর্জন করেননি। বস্তুর বিশ্লেষণী ক্ষমতা, বিচারবুদ্ধি এবং নিরূপিত সত্যকে প্রমাণ সহ পাঠকের নিকট উপস্থিত করবার সৎসাহস প্রবোধন্দ্রের রচনার বিশেষত্ব। ভাষাও যেমন সরল প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী, প্রকাশভঙ্গিও তেমন মনোহর ও সুন্দর। তাঁর এই কৈশোরাগত গুণগুলি 'ধর্মবিজয়ী অশোক' পুস্তকেও সর্বত্র ফুটে উঠেছে। তবে এখানে বিষয়বস্তু হচ্ছে ঐতিহাসিক এবং এর গুরুত্ব নির্ভর করছে লব্ধ তথ্য ও প্রমাণের যথাযথ বিচারের উপর।

পুস্তকের আলোচ্য বিষয় অশোকের ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি,

অহিংসা ও রাজনীতি, ধর্মনীতি, এবং ধর্মনীতির পরিণাম। অশোকের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস, সাম্রাজ্যের সীমা ও রাষ্ট্রীয় শাসন প্রভৃতি মুখ্য আলোচ্য বিষয় নয়। সংক্ষিপ্ত হলেও প্রবোধচন্দ্রের গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ, এবং বিস্তারিত হলেও আমার *Asoka and His Inscriptions* অপূর্ণ। অশোকের উদার ধর্মনীতির সহিত আকবরের সাম্যনীতির তুলনা করে তিনি তাঁর আলোচনাকে পূর্ণরূপ দিতে পেরেছেন, আমি গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে মুসলমান আমলের ইতিহাস আলোচনা করিনি।

প্রাক্‌মুসলমান যুগে, বিশেষত বৌদ্ধধর্ম এবং অশোকের ধর্মবিজয় ও ধর্মনীতি সম্পর্কে, সব চেয়ে দেখবার ও ভাববার বিষয় দেবোপাসনা- ও যাগযজ্ঞ-পরায়ণ বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংকীর্ণ রাজনীতি ও সমাজ-গঠনের সহিত উদারপন্থার বিভেদ, ঐ বিভেদের ফলে বিরোধিতা, বিরোধিতার ফলে সংকীর্ণতার উদ্দামতা, ক্রমে জাতীয় জীবনের অধোগতি, দাসত্বের বহু প্রকারভেদ ও জটিলতা, অশ্বমেধ যজ্ঞের পুনরাবির্ভাব ও বাড়াবাড়ি, স্তরে স্তরে জাতিবিন্যাস, ভেদবুদ্ধি, কুটিলতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরিণামে পরবশতা। এ বিষয়ে আমাদের প্রমাণ ও যুক্তির ধারা অনেকাংশে অভিন্ন ও এক। মুখ্যত একটি বিষয়ে আমাদের মতের মধ্যে অনৈক্য আছে।

গ্রন্থের অংশবিশেষে প্রবোধচন্দ্র অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর অভিমত ও যুক্তির প্রভাব এড়াতে পারেননি। সে অংশে আলোচনা করা হয়েছে অশোকের ধর্মনীতির পরিণাম। মৌর্যসাম্রাজ্যের অবনতি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির চারটি প্রধান কারণ সতর্কতার সহিত আলোচিত হলেও মোটের উপর গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত অশোকের বিরুদ্ধে।

একথা সত্য যে, অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যসাম্রাজ্য অর্ধশতাব্দীর অধিক স্থায়ী হয়নি। এর অবসান ঘটেছে মগধে শুঙ্গমিত্র বংশের অভ্যুদয়ে। এর নিশ্চয় কোনো না কোনো কারণ ছিল। হয়তো গ্রন্থকারের দেওয়া চারটিই যথার্থ ও মুখ্য কারণ। তবে নাগার্জুনি পর্বতগুহার লিপিত্রয় থেকে জানা যায় যে, অশোকের উত্তরপুরুষ রাজা দশরথ দেবানংপিয় ও পিয়দসি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, অর্থাৎ তখন পর্যন্ত মৌর্যসাম্রাজ্য অব্যাহত ছিল। তারপর সবই প্রহেলিকাচ্ছন্ন। পালি দীপবংস ও মহাবংস অশোকের পরবর্তী কোনো মৌর্যসম্রাটের নাম করে না। বুঝতে হবে তাঁদের কেউ সদ্ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। দশরথও ছিলেন আজীবিক সম্প্রদায়ের উপাসক। পুরাণাদিতে একটি নামতালিকা মিলে। গার্গীসংহিতার যুগপুরাণ অংশে বিবৃত আছে যে, ইন্দ্রাবতার শালিশুক ছিলেন ধর্মের নামে অধার্মিক (ধর্মবাদী অধার্মিকঃ), স্বরাষ্ট্রমর্দনের ফলে প্রজাগণ এত রুষ্ট হয় যে শেষকালে তিনি তাঁর ধার্মিক প্রথিতগুণ ও কৃতী জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিজয়কে সিংহাসনে বসাতে বাধ্য হন। বিজয়ের রাজত্বকালে কিংবা অব্যবহিত পরে দুষ্টবিক্রম যবনগণ সাকেত, পঞ্চাল ও মথুরা জয়ের পর কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রকে কাদায় প্রোথিত করে রাজ্যের সর্বত্র হাহাকার তুলেছিল।

ততঃ সাকেতম্ আক্রম্য পঞ্চালান্ মথুরাংস্তথা।
যবনা দুষ্টবিক্রান্তাঃ প্রাপ্স্যন্তি কুসুমধ্বজম্॥
ততঃ পুষ্পপুরে প্রাপ্তে কর্দমে প্রোথিতে হিতে।
আকুলা বিষয়াঃ সর্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥

পুরাণাদির নামতালিকায় শালিশুক জনৈক পরবর্তী মৌর্য রাজা। কিন্তু যেভাবে যুগপুরাণ শালিশুকের আবির্ভাবকাল নির্দেশ করেছে

তাতে স্বতই মনে সন্দেহ জাগে যুগপুরাণের উক্তি আদৌ বিশ্বাস্ত কি না। বলা হয়েছে শৈশুনাগবংশীয় রাজারা পাটলিপুত্রে পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন বছর রাজত্ব করবে, তারপর আবির্ভাব হবে শালিশুকের। গর্গোক্ত যবন কারা? লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ-সেন ও কেশবসেনের তাম্রশাসনসমূহে গর্গযবন শব্দে তুরকি আক্রমণকারীকেই নির্দেশ করেছে :

গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রঃ।

যবনের আগমন সম্বন্ধে ৭২ শকাব্দে (১৫০ খ্রীষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ প্রথম রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালেখে বলা হয়েছে যে, অশোক মৌর্যের রাজত্ব শেষ হলে পর (অশোকস্য মৌর্যস্যংতে) যবনরাজ তুষাস্ফ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে নির্মিত সুদর্শন হ্রদের এক বাঁধ তৈরি করিয়ে-ছিলেন। 'তুষাস্ফ' এই পারসীক নামধারী যবনরাজ সম্ভবত এদেশের উত্তরপশ্চিম অঞ্চল থেকে গুজরাটে এসেছিলেন। পতঞ্জলিকৃত পাণিনীয় মহাভাষ্যের বর্ণনামতে পুষ্যমিত্রের সময়ে রাজপুতানার মধ্যমিকা অঞ্চলে যবনদের আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু এ পুষ্যমিত্র কে আমরা এখনও ঠিক জানি না। পুরাণাদিতে শুঙ্গ এবং কাণ্বদের পরবর্তী পুষ্যমিত্রদের উল্লেখ আছে। পাণিনীয় মহাভাষ্যের স্বনামধন্য গ্রন্থকার পতঞ্জলি শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক কি না সন্দেহ।

পতঞ্জলির মতানুসারে অত্রভবান্, আয়ুষ্মান্ ও দীর্ঘায়ুঃ শব্দের ন্যায় দেবানংপ্রিয়ও একটি সম্মানসূচক পদবী। হর্ষচরিতের টীকাকারের মতে দেবানাংপ্রিয় একটি পূজাবচন (honorific)। আমি মনে করি না যে, পাণিনির বার্তিককার কাত্যায়নের 'দেবানাংপ্রিয় ইতি চ মূর্খে' বচনটি অশোকের প্রতি বিদ্বেষ সূচনা করে। গ্রীক রাজদূত

মেগাস্থিনিস বলেন, তাঁর সময়ে এ দেশে দেবোপাসক ব্রাহ্মণগণ ছিলেন 'dear unto the gods' অর্থাৎ দেবানাংপ্রিয়। পালি অঙ্গুত্তর-নিকায়ের এতদগ্গ বগ্গে দেখা যায় বুদ্ধের সমসাময়িক শিষ্য স্থবির পিলিন্দবৎস দেবতানংপিয়দের মধ্যে অগ্রগণ্য। পালি অপদান গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পিলিন্দবৎস তাঁর পূর্বজন্মে বর্তমান ভদ্রকল্পে জনৈক মহানুভব রাজচক্রবর্তীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর ধার্মিক রাজশাসনের ফলে বহুলোক দেহত্যাগের পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে মর্ত্যে এসে তাঁর কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাত, এজন্যই তাঁর উপযুক্ত খ্যাতি হয়েছিল দেবতানংপ্রিয়।

ইমস্মিং ভদ্দকে কপ্পে একো আসি জনাধিপো।
মহানুভাবো রাজা সি চক্কবত্তি মহাবলো॥
সো হং পঞ্চসু সীলেসু ঠপেত্বা জনতং বহুং।
পাপেত্বা সুগতিং যেব দেবতানংপিয়ো অহুং॥

'ষষ্ঠ্যা আক্রোশে' পাণিনির এই সূত্রের মানে ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত অলুক্‌সমাসে আক্রোশ বোঝায়। কাত্যায়ন এর উপর মন্তব্য করলেন, দেবানাংপ্রিয়ের ন্যায় সম্মানসূচক পদবীও 'মূর্খ' অর্থে প্রযুক্ত হয়। দেবানাংপ্রিয় যে তাঁর সময়ে একটি প্রকৃষ্ট পূজাবচন ছিল, তাঁর মন্তব্য থেকে তাই শুধু প্রতীয়মান হয়। নচেৎ 'ইতি চ' নিপাতপূর্ব 'চ' অব্যয়টি নিরর্থক হয়। কাত্যায়নপ্রদত্ত দেবানাংপ্রিয়ের অনুযায়ী শব্দ সংস্কৃতে মহাব্রাহ্মণঃ, বাংলায় বড়োলোকের ছেলে, ইংরেজিতে learned।

পূর্বে বলেছি অশোকের পরবর্তী মৌর্য সম্রাট্ দশরথ ছিলেন আজীবিক সম্প্রদায়ের উপাসক। আজীবিকেরা ছিলেন জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্‌বক্তা। বৌদ্ধ কিংবদন্তীমতে এজন্যই ছিল বিন্দুসারের রাজপরিবারে জনৈক আজীবিকের বিশেষ প্রতিপত্তি। যথাপূর্বং

তথাপরং জ্যোতিষীরাই বহুক্ষেত্রে রাজা ও রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা। যুগপুরাণের প্রমাণেও অশোকের পরবর্তী মৌর্যগণের অধঃপতনের জন্য তাঁদের ধর্মের নামে অধর্মাচরণই দায়ী।

পালি মহাপরিনিব্বানসুত্তন্তে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে ভবিষ্যতে পাটলিপুত্রের তিন কারণে বিপদ্‌ হতে পারে, অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন কিংবা অন্তর্দ্রোহ। সে যে কখন ঘটেছিল তা এখনও আমরা জানিনে, অশোকের পূর্বে কিংবা পরে।

আমার মতে সাম্রাজ্যবিশেষের উত্থানপতন প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ। যেমন ব্যক্তিবিশেষের জীবনে যতই সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা হোক না কেন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তেমনি সাম্রাজ্যবিশেষেরও অবসান অবধারিত। বহু পুরাতন রাজবংশের পরিণাম আলোচনা করে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক দার্শনিক ইবনা খালদুন তাঁর মকদ্দিমা গ্রন্থে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যেমন ব্যক্তির পরমায়ু ১২০ বছর, রাজবংশের প্রকৃত স্থায়িত্বকালও তাই। প্রথম তিন পুরুষের আমলে রাজত্ব বেশ চলে, তৃতীয় পুরুষে তা চরমে পৌঁছে, পঞ্চম পুরুষের পর থেকে অধঃপতন ঘটতে থাকে।

অশোকের সময়ে মৌর্য সামরিক শক্তি অব্যাহত ছিল। তাঁর ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে দেখি কলিঙ্গজয়ের পাঁচ বছর পরেও তিনি তাঁর কোষ-দণ্ড-বলজনিত প্রভাব বা প্রভুশক্তি বিষয়ে সচেতন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে উপদ্রবকারী আটবিকগণকে সমুচিত দণ্ড দিয়ে তিনি পরে তাঁর অনিচ্ছাকৃত কার্যের জন্য অনুতাপ জানাচ্ছেন আর নিজের প্রভাব দ্বারা শাসাচ্ছেন 'ভদ্র হয়ে চল, নচেৎ হত্যা করা হবে'। তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে কোনো আক্রমণের আশঙ্কা হয়েছিল তা তাঁর কোনো লিপি থেকে প্রমাণিত হয় না।

পূর্বপ্রান্তে আশঙ্কার কারণ হয়েছিল, প্রমাণ কলিঙ্গে উৎকীর্ণ দ্বিতীয় স্বতন্ত্র গিরিলিপি। সম্ভবত তা তাঁর অভিষেকের ৩২তম কিংবা ৩৭তম বর্ষে উৎকীর্ণ হয়েছিল। তাতে তিনি সমীপবর্তী সামন্তগণকে শাসিয়েছেন এই বলে, 'আমি তোমাদের ক্ষমা করব আমার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত'। কাজেই তখন পর্যন্ত তাঁর কোষ-দণ্ড-বলপ্রসূত প্রভুশক্তি অটুট ছিল। তখন তাঁর পুত্রগণ শুধু যে বয়স্ক হয়েছিলেন তা নয়, তাঁরা প্রান্তীয় প্রদেশসমূহে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্রিপরিষদ্ সহ উপরাজার কার্যভার পেয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের অবসানের পটভূমিতে আমরা এরূপ একটি স্পষ্ট দৃশ্য দেখি তাঁর দ্বিতীয় স্বতন্ত্র কলিঙ্গ-গিরিলিপিতে।

চতুর্থ গিরিলিপিপ্রসঙ্গে 'ভেরীঘোস' শব্দে রণভেরীর নিনাদ অর্থ হতেই পারে না। 'ভেরীঘোসো অহো ধম্মঘোসো' উক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য প্রজাহিতৈষী পূর্ব পূর্ব রাজগণের অবলম্বিত ধর্মোৎসব এবং অশোকের অবলম্বিত ধর্মোপদেশ, প্রজাবর্গের ও জনমানবের আশানুরূপ চরিত্রোন্নতি সাধনের এ দুই উপায়ের কার্যকারিতার পার্থক্য দেখানো। নচেৎ চতুর্থ গিরিলিপি ও সপ্তম স্তম্ভলিপির ভণিতা অংশের কোনো মানে হয় না।

আমার বলবার উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবিশেষের উত্থানপতনের কারণগুলির উপরে জোর না দিয়ে ঐতিহাসিকের প্রধানত দেখা উচিত আদর্শবাদী অশোকের ধর্মনীতি ও ধর্মবিজয়পদ্ধতি ভারতসভ্যতা ও মানবসভ্যতার গতি কতটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। সুখের বিষয় প্রবোধচন্দ্র এর সুস্পষ্ট আভাস দিয়েছেন। এ বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা ও গবেষণা আজ অবধি হয়নি। আশা ছিল আমি নিজেই পরে এ সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হব।

আর অধিক লিখে প্রস্তাবনার সীমা অতিক্রম করা উচিত মনে করি না। তবে উপসংহারে বলা কর্তব্য যে, দুএকটি বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও লেখকের স্বদত্ত তথ্য এবং মৌলিক যুক্তি ও বিচারগুলি আমার কাছে খুবই উপাদেয় মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস গ্রন্থটি যে-ভাবে লেখা তাতে এটি সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই সমাদৃত হবে। আমি এও আশা করি যে, প্রবোধচন্দ্র অশোক সম্বন্ধে বৃহত্তর গ্রন্থ লিখে সকলকে উপকৃত করবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ জানুয়ারী ১৯৪৭

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া

ভূমিকা

প্রিয়দর্শী অশোক প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূর্ত স্বরূপ। তাঁর চরিত্রে ও বাণীতেই ভারতবর্ষের সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। তিনি যে ধর্ম ও মৈত্রীর বাণী তৎকালীন সভ্য জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহন করে নিয়েছিলেন তার ফলেই ভারতবর্ষ চিরকালের জন্য বিশ্বমানবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জাতি-বর্ণ- ও ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা এবং সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের ভিত্তির উপরে সর্বভারতীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মহৎ জীবনের সাধনা। এই মহাসাধনার স্মৃতি আজও বিশ্বমানবের এক বৃহৎ অংশের চিত্তে উজ্জ্বলরূপে জাগরূক আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতবর্ষের অন্তর থেকে সে স্মৃতি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সহজে বা স্বল্পকালে সে বিলুপ্তি ঘটেনি। মহৎ জীবনের মহৎ আদর্শ মানবহৃদয়কে গভীরভাবে উদ্‌বুদ্ধ ও সুচিরকালের জন্য প্রেরণাদান না করে পারে না।

অশোকের মৈত্রীসাধনাও দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর তিরোধানের অনতিকাল পরে রচিত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ অঙ্গুত্তরনিকায়ে জম্বুখণ্ডের যে অধীশ্বর অদণ্ড ও অশস্ত্রের দ্বারা পৃথিবীজয় এবং ধর্ম ও সাম্যের দ্বারা রাজ্যশাসন করেছিলেন তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে।

মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রচণ্ড আসুরিক শক্তির আক্রমণে কলিঙ্গরাজ্য বিধ্বস্ত হবার প্রায় অব্যবহিত পরেই অশোক অনুতপ্তহৃদয়ে ও-রাজ্যের

অধিবাসীদের কল্যাণসাধনে ব্রতী হলেন। অস্ত্রবিজিত কলিঙ্গে তাঁর এই চিত্তবিজয়ব্রত যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ আছে ও-জনপদের প্রাচীন ইতিহাসেই। অশোকের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই কলিঙ্গ পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন করে। এই স্বাধীন কলিঙ্গের চেতবংশীয় জৈন সম্রাট্ খারবেলের (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতক) আধিপত্য উত্তরে অঙ্গমগধ ও দক্ষিণে পাণ্ড্যরাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু এই প্রবল পরাক্রান্ত জৈন নৃপতিও তাঁর হাথিগুম্ফা লিপিতে 'সবপাসংডপূজক' বলে বর্ণিত হয়েছেন। এই বিশেষণটি যে অশোকের 'দেবানং পিয়ে পিয়দসি রাজা সব পাসংডানি পূজয়তি' এই বাণীরই প্রতিধ্বনি তাতে সন্দেহ নেই। অশোকের অস্ত্রবিজয়ের প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করেও কলিঙ্গ তাঁর ধর্মবিজয়ের প্রভাবকে সানন্দেই স্বীকার করে নিয়েছিল।

অশোকের ত্রয়োদশ পর্বতলিপি থেকে জানা যায় তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যেও তিনি ধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্রভূমিও কলিঙ্গের ন্যায় স্বাধীনতা লাভ করে এবং ওই প্রদেশের সাতবাহনবংশীয় সম্রাট্‌গণ এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সাতবাহন-নৃপতিরা শুধু যে স্বীয় প্রদেশকে মৌর্য-সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত করেছিলেন তা নয়, তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক এবং অশ্বমেধাদি যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রিয়দর্শী অশোকের মৈত্রী ও অহিংসার আদর্শ তাঁদের চিত্তকেও জয় করে রাষ্ট্রীয় বিরোধের ঊর্ধ্বে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ গৌতমীপুত্রের (খ্রী ১০৬-১৩০) বর্ণনাপ্রসঙ্গে একটি খোদিত লিপিতে বলা হয়েছে যে তিনি কৃতাপরাধ শত্রুজনেরও প্রাণহিংসায় বিমুখ ছিলেন (কিতাপরাধে পি সতুজনে অপানহিসারুচি)। এই যে অপ্রাণহিংসারুচিতার জন্য গৌরববোধ,

এটা নিঃসন্দেহেই অশোকের অহিংসাবাণীপ্রচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল।

মহারাষ্ট্রের সাতবাহনবংশীয় সম্রাট্‌দের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মালব (রাজধানী উজ্জয়িনী) ও সুরাষ্ট্রের (কাঠিয়াবাড়) শকক্ষত্রপ রাজগণ। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে এই বংশের বিখ্যাত রাজা মহাক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামা পশ্চিম ভারতে একটি সুবিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। সুরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রাচীন গিরিনগরের (আধুনিক গিরনার) নিকটবর্তী একটি পর্বতগাত্রে অশোকের কয়েকটি অনুশাসন উৎকীর্ণ হয়েছিল। এই পর্বতটিরই আরেক অংশে উক্ত রুদ্রদামার আমলে ৭২ শকাব্দে (খ্রী ১৫০) উৎকীর্ণ একটি লিপি আছে। আধুনিক জুনাগড় সহরের নিকটে অবস্থিত বলে এই পর্বতলিপিটি জুনাগড়লিপি নামে খ্যাত হয়েছে। এই লিপিটিতে মৌর্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের নাম সুস্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে। এই লিপি থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাষ্ট্রিয় পুষ্যগুপ্ত গিরিনগরের অদূরে সুদর্শন নামে একটি বৃহৎ তড়াগ নির্মাণ করান। অশোকের পরে (মতান্তরে অশোকের আমলে) যবনরাজ তুষাস্ফ একটি বাঁধ ও কয়েকটি প্রণালীর দ্বারা তড়াগটিকে অলংকৃত করেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ওই বাঁধটি প্রবল ঝটিকায় বিনষ্ট হলে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামার আদেশে সেটি পুনর্নির্মিত হয়। দেখা যাচ্ছে রুদ্রদামার আমলে চন্দ্রগুপ্ত তথা অশোকের নামই যে শুধু ভারতবাসীর মনে সুস্পষ্টভাবে জাগরূক ছিল তা নয়, তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত কীর্তিও তখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবেই বিদ্যমান ছিল এবং সেই কীর্তিকে রক্ষা করবার আকাঙ্ক্ষাও তখনকার দিনে যথেষ্ট প্রবল ছিল। মৌর্যসম্রাট্‌দের আদর্শও তৎকাল পর্যন্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রেরণা জোগাতে বিরত হয়নি বলেই মনে হয়।

বিদেশাগত শকজাতীয় রাজারাও এই সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সাতবাহন সম্রাট্‌দের ন্যায় শকক্ষত্রপরাও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক বলে গর্ববোধ করতেন। জুনাগড়লিপিতে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামা সর্ববর্ণের রক্ষক এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিজয়ের আদর্শ অনুসারে 'ভ্রষ্টরাজপ্রতিষ্ঠাপক' বলে বর্ণিত হয়েছেন। ক্ষত্রিয়জনোচিত সংগ্রামদক্ষতাও তাঁর কম ছিল না। উক্ত লিপিতেই বলা হয়েছে 'অভিমুখাগতসদৃশশত্রু'র প্রতি 'প্রহরণবিতরণে' তিনি বিমুখ ছিলেন না। এই উক্তি ভারতবর্ষের অভিমুখাগত বিজিগীষু সেলুকসের প্রতিরোধকারী চন্দ্রগুপ্তের আদর্শের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এই দুর্ধর্ষ শকনৃপতিও সংগ্রামক্ষেত্রের বাইরে নরহত্যা থেকে বিরত থাকার কঠিন সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন 'আপ্রাণোচ্ছ্বাসাৎ-পুরুষবধনিবৃত্তিকৃতসত্যপ্রতিজ্ঞ'। এই প্রতিজ্ঞাগ্রহণ থেকে মনে হয় গৌতমীপুত্র সাতবাহনের ন্যায় শকমহাক্ষত্রপ রুদ্রদামার চিত্তেও অশোকের অবিহিংসানীতির প্রভাব যথেষ্ট সক্রিয় ছিল।

তারপর গুপ্তযুগের ইতিহাসে দেখি সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত (আনুমানিক ৩৩০-৩৮০) অশোকেরই একটি ধর্মস্তম্ভের গাত্রে স্বীয় কীর্তিকাহিনী উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। এই লিপিটি আজকাল সমুদ্রগুপ্তের এলহাবাদ-প্রশস্তি নামে খ্যাত হয়েছে। সমুদ্রগুপ্তের প্রপৌত্র স্কন্দগুপ্তের আমলেও (৪৫৫-৪৬৭) গিরিনগরের পর্বতগাত্রে অশোকের ধর্মলিপির (তথা রুদ্রদামার প্রশস্তির) অদূরেই একটি প্রশস্তি উৎকীর্ণ হয়েছিল। এটি এখন স্কন্দগুপ্তের জুনাগড়প্রশস্তি নামে পরিচিত। কিন্তু সে সময়ে অশোকের ধর্মলিপিগুলি জনসাধারণের বোধগম্য ছিল কি না নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কিন্তু তখনও অশোকের মহৎ কীর্তির কথা জনসাধারণের স্মৃতিতে অনির্বাণ দীপ্তিতেই বিদ্যমান ছিল, তার

প্রমাণ চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ানের বিবরণ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকেও মগধে অশোকের আমলের বিশাল রাজপ্রাসাদ তথা তৎকালীন চিকিৎসালয়গুলি দেখে ফা হিয়ানের হৃদয় বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়েছিল। এই চিকিৎসালয়গুলি যে অশোকের রুগ্ন মানুষ ও পশুর চিকিৎসাব্যবস্থারই ঐতিহাসিক পরিণতি তাতে সন্দেহ নেই।

বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকে (আনুমানিক পঞ্চম শতক) বর্ণিত চন্দ্রগুপ্তমৌর্যকর্তৃক মগধাধিকারের কাহিনী থেকে অনুমান করা যায় যে, অশোকমৌর্যের কথাও তৎকালে লোকসমাজে বিস্মৃত হয়ে যায়নি। বস্তুত তৎকালীন ভারতীয় এবং সিংহলীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে অশোক-স্মৃতির যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। দিব্যাবদান (চতুর্থ শতক) নামক সংস্কৃত গ্রন্থ, বিশেষত তার অশোকাবদান নামক প্রাচীন অংশ, থেকে বোঝা যায় গুপ্তসম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে অশোকের ইতিহাস অবিকৃত না থাকলেও তাঁর মহত্ত্বের প্রভাব নিষ্ক্রিয় ছিল না। দীপবংস (চতুর্থ শতক) এবং মহাবংস (পঞ্চম শতক) নামক পালিভাষায় রচিত সিংহলের ঐতিহাসিক কাব্যদুটিতেও অশোকের বিস্তৃত কাহিনী বর্ণিত আছে। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি নয়। কিন্তু সে সময়েও সুদূর সিংহলের অধিবাসীরাও যে অশোকের আদর্শ থেকে প্রেরণা লাভ করত সে কথা এই কাহিনী থেকেই প্রমাণিত হয়।

অতঃপর পুষ্যভূতিবংশীয় সম্রাট্ হর্ষবর্ধন ও চৈনিক মনীষী হিউএন্‌ৎসাঙের (সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ) কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। হর্ষবর্ধন অশোকের আদর্শে কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং হিউএন্‌ৎসাঙ ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তে অশোকের স্মৃতিবিজড়িত কত

স্তম্ভ ও স্তূপ দেখেছিলেন আর কত কাহিনী শুনেছিলেন তা উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকের ভারতবিবরণে বর্ণিত আছে। কিন্তু হিউএন্থ-সাঙের বিবরণ থেকে মনে হয় সম্ভবত তৎকালেই অশোকের ধর্মলিপিগুলি ভারতীয়গণের কাছে দুর্বোধ হয়ে গিয়েছিল। নতুবা অন্তত কতকগুলি অশোকলিপির মর্ম উক্ত বিবরণে অবশ্যই পাওয়া যেত বলে মনে করা যায়। সপ্তম শতকের উত্তরার্ধে আরেকজন চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ অশোকের একটি ভিক্ষুবেশী মূর্তি দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাতে বোঝা যায় অশোকের চরিত্র ও আদর্শ দেশের স্মৃতিতে তখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকেও যে অশোকের পুণ্যস্মৃতি ভারতীয় হৃদয় থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় বারাণসী ও কান্যকুব্জের গাহড়বালবংশীয় নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের (১১১৪-১১৫৪) সারনাথ-শিলালিপি থেকে। গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিষ্ঠাবান্ অনুরাগী। কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিও বিরূপ ছিলেন না। তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য একাধিক সংঘারাম ও বিহার নির্মিত হয়েছিল। কুমারদেবী ও বাসন্তদেবী নামে তাঁর দুইজন মহিষী ছিলেন বৌদ্ধ। উক্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় কুমারদেবী ধর্মাশোক নরাধিপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সারনাথে একটি নব-নির্মিত বিহারে ধর্মচক্রপ্রবর্তনরত বুদ্ধমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সম্ভবত এটিই ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোকস্মৃতির শেষ নিদর্শন।

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে স্থাপত্যশিল্পরসিক সুলতান ফিরুজ তুঘলক আমবালা জেলার অন্তর্গত তোপরা নামক স্থানে অশোকের একটি স্তম্ভ দেখে তার শিল্পসৌন্দর্যে মুগ্ধ হন এবং ১৩৫৬ সালে তিনি বহু ব্যয়ে ও বহু কষ্টে এটিকে তোপরা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত

করেন। এখনও সেটি ওখানে অক্ষতভাবেই বিদ্যমান আছে। ফিরুজ শাহ পরে মীরাট থেকেও আরেকটি অশোকস্তম্ভ দিল্লিতে আনয়ন করেন। এই স্তম্ভটি পরবর্তী কালে গুরুতর আঘাত পেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ১৮৬৭ সালে এই টুকরোগুলিকে জোড়া দিয়ে স্তম্ভটিকে দিল্লিতে তার পূর্বের জায়গাতেই পুনঃস্থাপন করা হয়। এখনও সেটি সেখানেই আছে। যাহোক, ফিরুজ শাহের আমলে দুটি অশোকস্তম্ভ দিল্লিতে স্থানান্তরিত হলেও তৎকালে স্তম্ভগাত্রের খোদিত লিপি পাঠ করা দূরের কথা, এ দুটি যে অশোকের নির্মিত একথাটিও কেউ জানতেন না। এভাবে অশোকের স্মৃতি ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে (১৬০৫) বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে পূর্বোক্ত এলাহাবাদস্তম্ভের গাত্রে তাঁর পূর্বপুরুষদের নাম উৎকীর্ণ করা উপলক্ষ্যে অশোকের দুটি লিপিকে যেভাবে নষ্ট করা হয়েছে তাতে একান্ত নির্মমতাই প্রকাশ পেয়েছে।

এই সপ্তদশ শতক থেকেই অশোকের কীর্তির প্রতি য়ুরোপীয়গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন থেকে তাঁরা এবিষয়ে ক্রমশ অধিকতর আগ্রহান্বিত হতে থাকেন এবং তাঁদের আগ্রহেই কালক্রমে অশোকের কীর্তি ও ইতিহাসের উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু তাঁদেরও এ বিষয়ে দীর্ঘকাল অন্ধকারে হাতড়াতে হয়েছিল। সপ্তদশ শতকে Quaint Tom Coryate তোপরা থেকে আনীত দিল্লির প্রস্তরস্তম্ভটিকে পিতলের তৈরি বলে ভ্রম করেছিলেন। স্তম্ভগাত্রের আশ্চর্য মসৃণতা ও চাকচিক্যই এই ভ্রান্তির হেতু। ঊনবিংশ শতকের গোড়াতে বিশপ হিবারও এটিকে ঢালাই করা ধাতুর তৈরি বলে বর্ণনা করেন।

ঊনবিংশ শতকেই য়ুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অশোকের ইতিহাস উদ্ধারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। অন্তত ১৮০৪ সাল থেকে বর্তমান

সময় অবধি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মহিসুর এবং পেশোয়ার থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে প্রায় ত্রিশটি স্থানে পর্বত- বা স্তম্ভ-গাত্রে কিংবা শিলাফলকে উৎকীর্ণ অশোকের বহু লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন পর্যন্ত অশোকের বত্রিশটি লিপির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু একই স্থানে একাধিক লিপি এবং একই লিপি বহু বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ হয়েছে। এদিক্ থেকে হিসাব করলে অশোকের লিপিসংখ্যা হয় একশো চুয়ান্ন। তার মধ্যে পনেরোটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯২৯ সালে শ্রীযুক্ত অনু ঘোষ কর্তৃক মাদ্রাজ প্রদেশের কুরনুল জেলায় য়েরাগুড়ি নামক স্থানে, এবং দুটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৩১ সালে শ্রীযুক্ত নারায়ণ রাও শাস্ত্রী কর্তৃক হায়দরাবাদ রাজ্যে তুঙ্গভদ্রার উত্তরতীরে পালকিগুণ্ডু ও গবীমঠ নামক স্থানে। এই সমস্ত বিস্মৃত লিপি ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হল বটে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় এগুলির পাঠোদ্ধারও সহজসাধ্য ছিল না। উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই য়ুরোপীয় মনীষীরা অশোকলিপির পাঠোদ্ধারে ব্রতী হন। বহু প্রয়াসের পর ১৮৩৭ সালে ইংরেজ মনস্বী জেমস প্রিনসেপ শিলাগাত্রস্থ মূক লিপি থেকে অশোকের বাণী উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অশোকের লিপিকে অবলম্বন করে নিরন্তর যে অজস্র গবেষণা চলছে তার সন্ধান নিলে বিস্মিত হতে হয়। বস্তুত অশোক সম্বন্ধে যত গবেষণা-আলোচনা হয়েছে, ভারতীয় ইতিহাসের অন্য কোনো ক্ষেত্রেই তত আলোচনা হয়নি। যাঁদের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে অশোকের চরিত্র ও বাণী দীর্ঘকালের বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার লাভ করে আধুনিক মানুষের চিত্তকেও মুগ্ধ করছে তাঁদের মধ্যে প্রিনসেপের পরেই সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, এমিলি সেনার, জি বুলার,

ভিনসেণ্ট স্মিথ, এফ ডব্‌ল্যু টমাস, ই হুল্ট্‌শ্‌, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বেণীমাধব বড়ুয়া প্রভৃতি মনস্বীদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এই দীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে শুধু যে অশোকের বিস্তৃত জীবনকাহিনী ভারতবর্ষের জাতীয় স্মৃতিতে নব দীপ্তিতে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে তা নয়, তাঁর চরিত্রই ভারতইতিহাসের মহত্তম ও উজ্জ্বলতম চরিত্র বলে স্বীকৃত হয়েছে। একজন আধুনিক ঐতিহাসিক (J. M. Macphail) অশোকচরিত্রকে হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন,

In the history of ancient India, the figure of Asoka stands out like some great Himalayan peak, clear against the sky, resplendent in the sun, while the lower and nearer ranges are hidden by the clouds.

এই উক্তির সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। বস্তুত ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ভূমিকায় হিমালয়ের যে স্থান, তার ঐতিহাসিক ভূমিকায় অশোকেরও সেই স্থান। তাঁর চরিত্রের উত্তুঙ্গ মহিমা ভারতইতিহাসের শিরোভাগে অবস্থান করে শুধু যে ভারতীয় ঐতিহ্যকে চিরকালের জন্য আশ্রয় দিয়েছে তা নয়, ভারতীয় গৌরবকেও জগতের কাছে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। বস্তুত অশোকের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও জাতীয় জীবন তার চরম সার্থকতা লাভ করেছিল এবং সে সার্থক্যের মহিমা আজও অনতিক্রান্ত রয়েছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোকের চরিতকথাই ঐতিহাসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সব চেয়ে বেশি। কিন্তু এ বিষয়ে যত

আলোচনা হয়েছে তার অধিকাংশই ইংরেজি ভাষায়। দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষায় অশোক সম্বন্ধে খুব কম আলোচনাই হয়েছে। দীর্ঘকাল পূর্বে (১৮৯২ সালে) কৃষ্ণবিহারী সেন অশোকচরিত-রচনার যে ধারা প্রবর্তন করেছিলেন, পরবর্তী কালে তা যথোচিতভাবে অনুসৃত হয়নি। এ বিষয়ে যে কয়খানি বাংলা বই আছে (গ্রন্থশেষে 'প্রমাণপঞ্জী' দ্রষ্টব্য) তার একখানিও নির্ভরযোগ্য নয় কিংবা আধুনিকতম গবেষণার পূর্ণপরিচায়ক নয়। বাংলা ঐতিহাসিক সাহিত্যের এই দীনতা অস্বীকার করা যায় না। এইজন্যই বর্তমান গ্রন্থখানি বাংলা ভাষাতেই রচিত হল।

কিন্তু এখনও বাংলা ভাষায় অশোকের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অভাব রইল। কেননা বর্তমান গ্রন্থে অশোকের ইতিহাস বা জীবন-কথার সমস্ত দিক্ নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। অশোকচরিত্রের যে দিক্‌টি তাঁকে সব চেয়ে বেশি মহত্ত্ব দান করেছে, এই গ্রন্থে শুধু সেই দিক্‌টাই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর মহৎ ধর্মনীতির জন্যই তিনি জগতের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। তাঁর রাষ্ট্রনীতিও প্রতিষ্ঠিত ছিল ধর্মনীতির উপরে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়েও তাঁর ধর্মনীতি সম্বন্ধে অস্পষ্ট বা ভ্রান্ত ধারণার প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমান সময়ে ধর্মসম্প্রদায়গত বিরুদ্ধতার দ্বারা ভারতবর্ষের জাতীয় তথা রাষ্ট্রনৈতিক জীবন শোচনীয়ভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। অশোকের আদর্শ হয়তো এই সমস্যার সমাধানে কিছু সহায়তা করতেও পারে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা লাভ করে তাকে জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করা চাই। কিন্তু কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা করলে ইতিহাসের

আশ্রয়ভূমিকেই বিনষ্ট করা হয়। ঐকান্তিক নিরপেক্ষতা সহকারে সত্যানুসন্ধানই ইতিহাসচর্চার তথা ঐতিহাসিকের একমাত্র লক্ষ্য। সেই সত্যের আলোকে বর্তমানের পথ নির্দেশ করা হচ্ছে তার ব্যাবহারিক দিক্ ; কিন্তু সে দায়িত্ব ঐতিহাসিকের নয়, জননায়কের।

অশোকের ধর্মপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রনীতির যথার্থ স্বরূপনির্ণয়ই এই গ্রন্থরচনার লক্ষ্য। সুতরাং স্বভাবতই আধুনিক গবেষণারীতির অনুসরণে পরবর্তিকালীন সমস্ত অনির্ভরযোগ্য কিংবদন্তী বর্জন করে একমাত্র অশোকলিপিগুলিকেই আলোচনার মুখ্য উপাদানরূপে স্বীকার করা হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থে পূর্বগামী গবেষকগণের মতামতের পুনরুক্তিমাত্র করা হয়নি। নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে ও নূতন তথ্যের আলোকে অশোকানুশাসনের ব্যাখ্যা তথা ঐতিহাসিকদের মতামতের পুনর্বিচার করা হয়েছে। অশোকের ধর্মবিজয়নীতি সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে পুনরালোচনা করে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি সেগুলিই এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু। তাছাড়া তৎকালীন ইতিহাসের এমন কয়েকটি দিকের উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি যে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে বলে জানি না। বলা বাহুল্য এরকম আলোচনায় পূর্বগামীদের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে মতভেদ ঘটা অনিবার্য। বিশেষজ্ঞদের অভিমতও বহু ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। বর্তমান আলোচনায় স্বভাবতই কোনো কোনো বিষয়ে এসব অভিমতকে অল্পাধিক পরিমাণে সমর্থন বা খণ্ডন করে সত্যানুসন্ধানে অগ্রসর হতে হয়েছে। পারস্পরিক মতবাদের এরকম বিচারের দ্বারাই ক্রমশ মতভেদ ঘুচে গিয়ে সর্ববাদিসম্মত সত্যনির্ণয়ের পথ সরল হয়ে আসে। বিভিন্ন মতবাদের অস্পষ্টতা ও জটিলতার মধ্যে সত্যের পথকে অন্তত কিছু পরিমাণে [illegible]

করা বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। এই গ্রন্থ যদি সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, অনুসন্ধিৎসুদের চিত্তে চিন্তার উদ্রেক করতে এবং সাধারণ পাঠকের মনে অশোক সম্বন্ধে আগ্রহ সঞ্চার করতে কিছুমাত্র সহায়ক হয় তা হলেই লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। নূতন দৃষ্টিতে প্রাচীন ইতিহাসের পুনর্বিচার সহজসাধ্য নয়। এরকম বিচারে অনবধানতাজাত বা অন্যবিধ ত্রুটি ঘটা খুবই সম্ভব। সহৃদয় পাঠক ও সমালোচকগণ যদি এজাতীয় ভুলত্রুটির প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা হলে বিশেষ উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হব।

এই পুস্তকের চারটি অধ্যায়ই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথমটি পূর্বাশায় (১৩৫২ আশ্বিন) এবং বাকি তিনটি বিশ্বভারতী-পত্রিকায় (১৩৪৯ ভাদ্র এবং ১৩৫০ শ্রাবণ-আশ্বিন ও কার্তিক-পৌষ)। গ্রন্থাকারে সংকলনকালে প্রয়োজনমতো কিছু কিছু সংশোধন ও সংযোজন করা হল। অশোকচরিত্রের বিভিন্ন দিকের বিচার উপলক্ষ্যে যেসব উপাদানপুস্তক ও প্রবন্ধাদি ব্যবহৃত হয়েছে সেসমস্তই যথাস্থানে পাদটীকারূপে উল্লিখিত হল। অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য যেসব পুস্তকে অশোকের বাণী ও ইতিহাসের আলোচনা পাওয়া যায়, গ্রন্থের অনুষঙ্গ বিভাগে প্রমাণপঞ্জী অংশে সেগুলির নাম তালিকাকারে প্রকাশ করা গেল। তাছাড়া গ্রন্থের আরম্ভে অশোকের রাষ্ট্রসাম্রাজ্য ও ধর্ম-সাম্রাজ্যের একটি মানচিত্র এবং শেষে একটি বিস্তৃত নির্দেশিকাও দেওয়া গেল। আশা করি তাতে বইটি ব্যবহার করার পক্ষে কিছু সহায়তা হতে পারে। বৎসরাধিক কাল পূর্বেই বইটি যন্ত্রস্থ হয়েছিল এবং মূল বইএর মুদ্রণকার্য গত আষাঢ় মাসেই সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তারপরে কলকাতায় যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দেয় তার ফলে বইটি যথাসময়ে প্রকাশিত হতে পারেনি।

সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে ভারতইতিহাসের দুই প্রান্তে দুটি সমুচ্চ শিখর, ধবলগিরি ও কাঞ্চনজঙ্ঘা, প্রাচীন কালের রাজভিক্ষু প্রিয়দর্শী অশোক এবং আধুনিক কালের ভিক্ষুরাজ মহাত্মা গান্ধী। উভয়ের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা এক, সর্বলোকহিতব্রত তাঁদের লক্ষ্য, এবং ধর্ম ও মৈত্রীর পতাকাহস্তে বিশ্বচিত্তবিজয় তাঁদের সাধনা। উভয়ের পুণ্যচরিত ও মহৎ আদর্শকে আশ্রয় করে সমগ্র ভারতবর্ষ একই কেন্দ্রে সংহত হয়ে অপূর্ব ঐক্য লাভের দুর্লভ সুযোগ পেয়েছে। বস্তুত এই দুইজনেরই চারিত্রিক আভায় ভারতীয় ঐতিহ্য চিরকালের জন্য উজ্জ্বল হয়েছে, আর তাঁদেরই জীবনসাধনার ফলে ভারতবর্ষের প্রতি বিশ্বজগতের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। ভারতবর্ষের এই দুই মহাব্যক্তির একজনের সমকালে বিদ্যমান থাকা একটা দুর্লভ সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে একথা স্মরণ করে এই সামান্য পুস্তকখানি মহাত্মা গান্ধীকেই শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করলাম।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁদের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছি তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিসাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়াকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কাছেই অশোকের লিপি অবলম্বনে তৎকালীন ইতিহাসবিচারে দীক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি যেভাবে তাঁর এই ছাত্রকে সমকক্ষরূপে গণ্য করে অশোকানুশাসনের দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন তাতে শুধু যে জ্ঞানলাভের দিক্ থেকেই উপকৃত হয়েছি তা নয়, তাঁর উদার সহৃদয়তায়ও মুগ্ধ হয়েছি। অল্প কিছু দিন হল *Inscriptions of Asoka* এবং *Asoka and His Inscriptions* নামে তাঁর দুটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থদুটি প্রত্নতাত্ত্বিক জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং অশোকের ন্যায়

বিরাট্ পুরুষের যোগ্য ঐতিহাসিক অর্ঘ্য। তাঁর এই দুটি গ্রন্থ যে ঐতিহাসিক জগতে দীর্ঘকাল অশোকবিষয়ক গবেষণার চরম নিদর্শন ও প্রামাণিক আদর্শ বলে স্বীকৃত হবে তাতে সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় 'ধর্মবিজয়ী অশোক'এর মূল অংশের মুদ্রণকার্য শেষ হয়ে যাবার পরে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাই এই পুস্তকে অধ্যাপক বড়ুয়ার মূল্যবান্ মতামতের পর্যালোচনা করার সুযোগ পাইনি। সুখের বিষয় তাঁর অধিকাংশ অভিমতই আমার সিদ্ধান্তের অনুকূল এবং কোনো মুখ্য বিষয়েই তাঁর সঙ্গে গুরুতর মতপার্থক্য হয়নি। যাহোক, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের সহায়তা থেকে আমি একেবারে বঞ্চিত হইনি। তিনি সানন্দে এই পুস্তকটির একটি প্রস্তাবনা লিখে দিয়ে এটির মর্যাদাবৃদ্ধি করেছেন এবং তাঁর এই প্রাক্তন ছাত্রের অধিকতর শ্রদ্ধা- ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। যে যে বিষয়ে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেন উক্ত প্রস্তাবনায় সেগুলি উল্লিখিত হয়েছে। আশা করি তাতে সত্যসন্ধিৎসার পথ সুগম হবে।

স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্যের উৎসাহ ও আগ্রহেই বইটি পূর্বাশা গ্রন্থনালয় থেকে প্রকাশিত হল। বইটির সর্বপ্রকার অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পাদনের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন। বিশ্বভারতী-গ্রন্থনবিভাগের শ্রীপুলিনবিহারী সেনের কাছে নানা বিষয়ে সুহৃদ্জনোচিত পরামর্শ ও সহায়তা পেয়েছি। শিল্পীবন্ধু শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অভিপ্রায় অনুসারে অশোকবাণীর ব্রাহ্মীলিপি-অংশ এবং মানচিত্রখানি এঁকে দিয়েছেন। প্রুফসংশোধন ও নির্দেশিকাসংকলন প্রভৃতি নানা বিষয়ে আমার সোদরপ্রতিম ছাত্র ও সহকর্মী শ্রীমান্ অমিয়কুমার সেনের

সহযোগিতা পেয়েছি। আমার পুত্র শ্রীমান্ দীপংকর সেন নির্দেশিকার নামচয়ন, অশোকবাণীর ব্রাহ্মীপ্রতিলিপি রচনা ও অন্য কোনো কোনো বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
২৭ মাঘ ১৩৫৩

প্রবোধচন্দ্র সেন

অশোকের বাণী

𑀥𑀁𑀫𑁂 𑀲𑀸𑀥𑀽 𑀓𑀺𑀬𑀁 𑀘𑀼 𑀥𑀁𑀫𑁂 𑀢𑀺 𑀅𑀧𑀸𑀲𑀺𑀦𑀯𑁂 𑀩𑀳𑀼𑀓𑀬𑀸𑀦𑁂 𑀤𑀬𑀸 𑀤𑀸𑀦𑁂 𑀲𑀘𑁂 𑀲𑁄𑀘𑀬𑁂

ধংমে সাধু। কিয়ং চু ধংমে তি? অপাসিনবে বহুকয়ানে দয়া দানে সচে সোচয়ে।

ধর্মই সাধু। কিন্তু এই ধর্ম কি? অপুণ্যবিমুখতা কল্যাণপরায়ণতা দয়া দান সত্য ও পবিত্রতাই ধর্ম।

𑀥𑀁𑀫𑀘𑀭𑀡𑁂 𑀧𑀺 𑀦 𑀪𑀯𑀢𑀺 𑀅𑀲𑀻𑀮𑀲

ধংমচরণে পি ন ভবতি অসীলস।

শীলহীনের ধর্মাচরণও হয় না।

𑀇𑀫𑀸𑀦𑀺 𑀆𑀲𑀺𑀦𑀯𑀕𑀸𑀫𑀻𑀦𑀺 𑀦𑀸𑀫 𑀅𑀣 𑀘𑀁𑀟𑀺𑀬𑁂 𑀦𑀺𑀞𑀽𑀮𑀺𑀬𑁂 𑀓𑁄𑀥𑁂 𑀫𑀸𑀦𑁂 𑀇𑀲𑁆𑀬𑀸

ইমানি আসিনবগামীনি নাম অথ চংডিয়ে নিঠুলিয়ে কোধে মানে ইস্যা।

চণ্ডতা নিষ্ঠুরতা ক্রোধ মান ও ঈর্ষ্যা অপুণ্যের হেতু।

𑀦𑀲𑁆𑀢𑀺 𑀳𑀺 𑀓𑀁𑀫𑀢𑀭𑀁 𑀲𑀯𑀮𑁄𑀓𑀳𑀺𑀢𑀢𑁆𑀧𑀸

নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোকহিতৎপা।

সর্বলোকের হিতসাধন অপেক্ষা মহত্তর কর্ম নাই।

𑀓𑀮𑀸𑀦𑀁 𑀤𑀼𑀓𑀭𑀁 𑀬𑁂 𑀆𑀤𑀺𑀓𑀭𑁂 𑀓𑀮𑀸𑀦𑀲 𑀲𑁂 𑀤𑀼𑀓𑀭𑀁 𑀓𑀭𑁄𑀢𑀺

কলাণং দুকরং। য়ে আদিকরে কলাণস সো দুকরং করোতি।

কল্যাণসাধন দুষ্কর। যিনি আদিকল্যাণকৃৎ তিনি দুঃসাধ্যসাধনই করেন।

𑀯𑀺𑀧𑀼𑀮𑁂 𑀢𑀼 𑀧𑀺 𑀤𑀸𑀦𑁂 𑀬𑀲 𑀦𑀲𑁆𑀢𑀺 𑀲𑀬𑀫𑁂 𑀪𑀸𑀯𑀲𑀼𑀥𑀺𑀢𑀸 𑀯
𑀓𑀢𑀁𑀜𑀢𑀸 𑀯 𑀤𑀠𑀪𑀢𑀺𑀢𑀸 𑀘 𑀦𑀻𑀘𑀸 𑀩𑀸𑀠𑀁

বিপুলে তু পি দানে য়স নাস্তি সয়মে ভাবসুধিতা ব কতংঞতা ব দঢ়ভতিতা চ নীচা বাঢ়ং।

যার সংযম ভাবশুদ্ধি কৃতজ্ঞতা ও দৃঢ়নিষ্ঠা নাই, বিপুল ধনের দাতা হলেও সে নীচপ্রকৃতি।

𑀦𑀲𑁆𑀢𑀺 𑀏𑀢𑀸𑀭𑀺𑀲𑀁 𑀤𑀸𑀦𑀁 𑀬𑀸𑀭𑀺𑀲𑀁 𑀥𑀁𑀫𑀤𑀸𑀦𑀁 𑀥𑀁𑀫𑀲𑀁𑀲𑁆𑀢𑀯𑁄 𑀯
𑀥𑀁𑀫𑀲𑀁𑀩𑀁𑀥𑁄 𑀯

নাস্তি এতারিসং দানং য়ারিসং ধংমদানং ধংমসংস্তবো বা ধংমসংবংধো বা।

ধর্মদানের ন্যায় দান নাই, ধর্মমিলনের ন্যায় মিলন নাই, ধর্মসম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধ নাই।

𑀬𑀁 𑀘𑀼 𑀫𑁄𑀔𑁆𑀬𑀫𑀼𑀢𑁂 𑀯𑀺𑀚𑀬𑁂 𑀏 𑀥𑀁𑀫𑀯𑀺𑀚𑀬𑁂

ইয়ং চু মোখ্যমুতে বিজয়ে এ ধংমবিজয়ে।

ধর্মবিজয়ই মুখ্য বিজয়।

𑀆𑀢𑁆𑀧𑀧𑀸𑀲𑀁𑀟𑀧𑀽𑀚𑀸 𑀯 𑀧𑀭𑀧𑀸𑀲𑀁𑀟𑀕𑀭𑀳𑀸 𑀯 𑀦𑁄 𑀪𑀯𑁂
𑀅𑀧𑀓𑀭𑀡𑀫𑁆𑀳𑀺 𑀬𑁄 𑀳𑀺 𑀓𑁄𑀘𑀺 𑀆𑀢𑁆𑀧𑀧𑀸𑀲𑀁𑀟𑀁 𑀧𑀽𑀚𑀬𑀢𑀺
𑀧𑀭𑀧𑀸𑀲𑀁𑀟𑀁 𑀯𑀸 𑀕𑀭𑀳𑀢𑀺 𑀲𑁄 𑀘 𑀧𑀼𑀦 𑀢𑀣 𑀓𑀭𑀸𑀢𑁄
𑀆𑀢𑁆𑀧𑀧𑀸𑀲𑀁𑀟𑀁 𑀩𑀸𑀠𑀢𑀭𑀁 𑀉𑀧𑀳𑀦𑀸𑀢𑀺

আৎপপাসংডপূজা ব পরপাসংডগরহা ব নো ভবে অপকরণম্হি। য়ো হি কোচি আৎপপাসংডং পূজয়তি পরপাসংডং বা গরহতি সো চ পুন তথ করাতো আৎপপাসংডং বাঢ়তরং উপহনাতি।

অকারণে স্বসম্প্রদায়ের প্রশংসা ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা করা উচিত নয়। যিনিই স্বসম্প্রদায়ের প্রশংসা ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা করেন তিনি স্বসম্প্রদায়েরই গুরুতর ক্ষতি করেন।

𑀧𑀽𑀚𑁂𑀢𑀬𑀸 𑀢𑀼 𑀏𑀯 𑀧𑀭𑀧𑀸𑀲𑀁𑀟𑀸 𑀢𑁂𑀦 𑀢𑁂𑀦 𑀧𑁆𑀭𑀓𑀭𑀡𑁂𑀦
𑀏𑀯𑀁 𑀓𑀭𑀼𑀁 𑀆𑀢𑁆𑀧𑀧𑀸𑀲𑀁𑀟𑀁 𑀘 𑀯𑀠𑀬𑀢𑀺 𑀧𑀭𑀧𑀸𑀲𑀁𑀟𑀲 𑀘
𑀉𑀧𑀓𑀭𑁄𑀢𑀺

পূজেতয়া তু এব পরপাসংডা তেন তেন প্রকরণেন। এবং করুং আৎপপাসংডং চ বঢ়য়তি পরপাসংডস চ উপকরোতি।

পরসম্প্রদায়কেও বিশেষ বিশেষ কারণে শ্রদ্ধা করা উচিত। যিনি তা করেন তিনি স্বসম্প্রদায়কেও উন্নত করেন, পরসম্প্রদায়েরও উপকার করেন।

𑀲𑀫𑀯𑀸𑀬𑁄 𑀏𑀯 𑀲𑀸𑀥𑀼 𑀓𑀺𑀁𑀢𑀺 𑀅𑀁𑀜𑀫𑀁𑀜𑀲 𑀥𑀁𑀫𑀁 𑀲𑁆𑀭𑀼𑀡𑀸𑀭𑀼 𑀘
𑀲𑀼𑀲𑀼𑀲𑁂𑀭 𑀘

সমবায়ো এব সাধু। কিংতি, অংঞমংঞস ধংমং স্রুণারু চ
সুসুসের চ।

পারস্পরিক মিলনই সাধু। কেন না, তাতে পরস্পরের ধর্মনীতি জানা যায়, জানার আগ্রহও হয়।

𑀲𑀸𑀭𑀯𑀠𑀻 𑀅𑀲 𑀲𑀯𑀧𑀸𑀲𑀁𑀟𑀸𑀦𑀁 𑀲𑀯𑀧𑀸𑀲𑀁𑀟𑀸 𑀩𑀳𑀼𑀲𑁆𑀭𑀼𑀢𑀸 𑀘
𑀅𑀲𑀼 𑀓𑀮𑀸𑀡𑀸𑀕𑀫𑀸 𑀘 𑀅𑀲𑀼

সারবঢ়ী অস সবপাসংডানং। সবপাসংডা বহুস্রুতা চ
অসু কলাণাগমা চ অসু।

সব সম্প্রদায়েরই সারবৃদ্ধি হোক। সব সম্প্রদায়ই বহুধর্মজ্ঞ ও কল্যাণপরায়ণ হোক।

অশোকপ্রশস্তি

চক্কবত্তী অহুং রাজা জম্বুসণ্ডস্স ইস্সরো।
মুদ্ধাভিসিত্তো খত্তিয়ো মনুস্সাধিপতী অহুং
অদণ্ডেন অসত্থেন বিজেয্য পঠবিং ইমং
অসাহসেন ধম্মেন সমেনমনুসাসিয়া,
ধম্মেন রজ্জং কারেত্বা অস্মিং পঠবিমণ্ডলে
মহদ্ধনে মহাভোগে অড্ঢে অজায়িসং কুলে
সব্বকামেহি সম্পন্নে রতনেহি চ সত্তহি।

—অঙ্গুত্তরনিকায, অব্যাকতবগ্‌গ

তাৎপর্য : জম্বুখণ্ডের অধীশ্বর এক চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়; মহাধনী মহাভোগী সপ্তরত্ন- ও সর্বকাম-সম্পন্ন আঢ্য কুলে তাঁর জন্ম। তিনি পৃথিবী জয় করেছিলেন অদণ্ড ও অশস্ত্রের দ্বারা, আর রাজ্যশাসন করেছিলেন অপীড়ন ধর্ম ও সম নীতির দ্বারা।

জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ অশোকের মহাবাণী কত শত বৎসর মানবহৃদয়কে আহ্বান করিয়াছে। যে পুণ্যস্থানে ভগবান্ বুদ্ধ মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, রাজচক্রবর্তী অশোক সেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

—রবীন্দ্রনাথ

Asoka made Buddhism a world religion, not by adding to, or modifying or improving on, it, but by emphasising the elements of universality that it had always contained. He realised and acted on the truth that true religion is personal and spiritual, not a matter of ceremonial or of ritual, but of conviction and conduct. He rose above all distinctions of race. Remote as he is from us in point of time, we feel that his life has enriched ours.

J. M. Macphail

He is the only military monarch on record who abandoned warfare after victory. He made— he was the first monarch to make— an attempt to educate his people into a common view of the ends and way of life. Asoka worked sanely for the real needs of men. From the Volga to Japan his name is still honoured. More living men cherish his memory today than has ever heard the names of Constantine or Charlemagne.

H. G. Wells

A state can be based on non-violence, that is, it can offer non-violent resistance against a world combination based on armed force. Such a state was Asoka's. The example can be repeated. But the case does not become weak even if it be shown that Asoka's state was not based on non-violence.

M. K. Gandhi

সূচি

ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি

পৃথিবীর ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকটি একটি বিস্ময়কর যুগ বলে গণ্য হয়ে থাকে। নানা দিক্ থেকেই এই শতকটির ঐতিহাসিক বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেছেন, The sixth century B. C. was a time when men's minds in several widely separated parts of the world were deeply stirred by the problems of religion and salvation।[১] এই শতকেই চীনবর্ষে খংফুৎসে (ইংরেজি উচ্চারণ মারফতে যাঁকে আমরা সাধারণত কনফ্যুসিয়াস নামে জানি) এবং লাওৎসে, ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধ এবং বর্ধমান মহাবীর, আর ইরানে জরথুষ্ট্র (এঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে) আবির্ভূত হয়েছিলেন। এতগুলি মহাপুরুষের যুগপৎ আবির্ভাবের ঐতিহাসিক গৌরব কম নয়। কিন্তু ধর্মচিন্তা এবং ধর্মপ্রবর্তনই উক্ত শতকের একমাত্র গৌরব নয়। রাষ্ট্রচিন্তা এবং দিগ্‌বিজয়ের মহিমাও এই যুগকে কম বিশিষ্টতা দান করেনি। যে প্রজাতন্ত্রের গৌরবে য়ুরোপের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস গৌরবান্বিত, এই শতকেই সোলোন ও ক্লাইস্‌থিনিসের চেষ্টায় এথেন্‌সের নগরশাসনতন্ত্রে তার প্রথম সূচনা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে আর্য-দিগ্‌বিজয় এবং আর্যসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সূচনাও হয় এই সময়েই। আর্য-ইতিহাসের এই বাহুবলগৌরবের কেন্দ্র ছিল ইরান। ইরানসম্রাট্ কুরুষ্ (খ্রী পূ ৫৫৮-৫৩০), কম্বুষ (৫৩০-৫২২) এবং দারয়বৌষ্ (৫২২-৪৮৬) স্বীয় বাহুবলে যে বিশাল আর্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

১ Oxford History of India, পৃ ৪৮।

তৎকালীন ইতিহাসে তার তুলনা নেই। লক্ষ্য করবার বিষয়, সেই যুগে আর্যসভ্যতার কেন্দ্র ছিল তিনটি—গ্রীস, ইরান ও ভারতবর্ষ। এই তিন দেশে আর্যসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তিনটি বিশিষ্টরূপে—গ্রীসে রাষ্ট্রচিন্তা ও ডিমক্রেসির প্রতিষ্ঠায়, ইরানে দিগ্‌বিজয় ও সাম্রাজ্যস্থাপনে এবং ভারতবর্ষে তত্ত্বচিন্তা ও ধর্মপ্রবর্তনে।

ইরানে আর্যশক্তির অভ্যুদয়ের পূর্বে ছিল অনার্য আসিরীয় অর্থাৎ অসুর শক্তির দুর্দান্ত প্রতাপ। তখনকার দিনে দিগ্‌বিজয়ী অসুরদের সামরিক শক্তি ছিল অপ্রতিরোধ্য এবং তাদের সাম্রাজ্য ছিল দিগন্তবিস্তৃত। কিন্তু আর্যশক্তির অভ্যুত্থানের ফলে দুর্ধর্ষ অসুরসাম্রাজ্যের পতন ঘটল। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের একেবারে শেষভাগে বিশাল অসুরসাম্রাজ্য নবোদিত আর্যশক্তির পদানত হল। বিজয়ী ইরানী আর্যরা পরাজিত অসুরদের কাছ থেকে যে সমরপ্রতিভা ও দিগ্‌বিজয়নীতির উত্তরাধিকারী হল তার ঐতিহাসিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। আর্যরা সমগ্র অসুরসাম্রাজ্য অধিকার করেও ক্ষান্ত হল না, তার পরিধিকে দিকে দিকে সম্প্রসারিত করতে উদ্যত হল। হখামনিসীয় (Achaemenian) বংশের প্রথম তিন জন সম্রাটের আমলেই আর্যসাম্রাজ্যের চরম বিস্তার ঘটে। প্রথম সম্রাট্ কুরুষ্ (Cyrus) পশ্চিম দিকে এশিয়া মাইনরের শেষ প্রান্তস্থিত যবনরাজ্যগুলিকে পরাভূত করেন এবং পূর্বদিকে কাবুল নদীর তীরস্থিত জনপদসমূহকে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এইভাবে ইজিয়ান সাগরের তীর থেকে কাবুল পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড হখামনিসীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তাতেও এই সাম্রাজ্যের অধিপতিদের দিগ্‌বিজয়-লালসা পরিতৃপ্ত হল না। কুরুষ্‌পুত্র সম্রাট্ কম্বুষের (Cambyses) বিজয়বাহিনী দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে প্রাচীনগৌরবমণ্ডিত মিশর এবং তার পশ্চিম পার্শ্বস্থিত সাইরিনি দেশ জয় করে ইরানসাম্রাজ্যের কুক্ষিভুক্ত

করেন। অতঃপর তৃতীয় সম্রাট্ দারয়বৌষের (Darius) বিশ্ববিজয়লিপ্সা তাঁকে আবার পূর্বে ও পশ্চিমে রাজ্যবিস্তারে প্ররোচিত করে। পূর্ব দিকে গন্ধার (বর্তমান পেশোয়ার ও রাওলপিণ্ডি) ও সিন্ধুদেশ তাঁর অধিকারভুক্ত হয় এবং পশ্চিম দিকে তিনি এসিয়ার সীমা অতিক্রম করে গ্রীসের উত্তর প্রান্তবর্তী থেস ও মাকিদন রাজ্য জয় করেন।

এইভাবে যে বিশাল ইরানীয় বা পারসীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল, ভারতবর্ষের ইতিহাস তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। ভারতবর্ষে তার প্রতিক্রিয়া কিভাবে দেখা দিয়েছিল সেটা আমাদের বিবেচ্য। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, পারসীক সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের প্রান্তস্পর্শ মাত্র করেছিল, মর্মস্পর্শ করতে পারেনি। তা ছাড়া, সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে পারসীকদের কোনো সংঘর্ষ বাধেনি। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে উক্ত সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ প্রভাব খুবই কম। কিন্তু তার ব্যবহিত ও পরোক্ষ প্রভাবের গুরুত্ব কম নয়। সে কথাই আমাদের বিশেষভাবে বিবেচ্য। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কুরুষ্ (খ্রী পূ ৫৫৮-৫৩০) এবং দারয়বৌষের (খ্রী পূ ৫২২-৪৮৬) বিজয়বাহিনী যখন ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে কাবুল, গন্ধার ও সিন্ধুদেশ অধিকারে ব্যাপৃত ছিল, সে সময়েই ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে মগধরাজ বিম্বিসার (আনুমানিক খ্রী পূ ৫৪৫-৪৯৩) ও তৎপুত্র অজাতশত্রু (আনুমানিক খ্রী পূ ৪৯৩-৪৬১) ভাবী মগধসাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধ (আনুমানিক খ্রী পূ ৫৬৫-৪৮৬) বিশ্বমৈত্রীর বিপুল সম্ভাব্যতাপূর্ণ নবধর্মের উদ্‌বোধনকার্যে নিরত ছিলেন। বিম্বিসার-অজাতশত্রুর অনুসৃত বিশ্ববিজয়ের আদর্শ এবং বুদ্ধপ্রবর্তিত বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই দুই বিরুদ্ধ আদর্শের যুগপৎ আবির্ভাব একটি বিশেষভাবে স্মরণীয় ঘটনা। পরবর্তীকালে এমন এক সংকট দেখা দিয়েছিল যখন ভারতবর্ষকে এই দুই আদর্শের একটি বেছে

নেবার প্রয়োজন হয়েছিল। সে কথা পরে বলা যাবে। এখন এইটুকু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যে-সময়ে ভারতবর্ষে বিশ্ববিজয় ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ প্রথমে দেখা দিল ঠিক সে সময়েই ইরানের পূর্ণপরিণত বিশ্ববিজয়-আদর্শ ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে প্রসারিত হয়েছিল এবং এই ইরানীয় আদর্শ উত্তরকালে ভারতীয় দুই আদর্শের উপরেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গের অবতারণা করবার পূর্বে যবনদেশে অর্থাৎ গ্রীসে এই ইরানীয় সাম্রাজ্যবিস্তারের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার।

আমরা দেখেছি দারয়বৌষের আমলে ইরানসাম্রাজ্য যখন পূর্বে সিন্ধুতীর থেকে পশ্চিমে মাকিদন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় ঠিক সে সময়েই গ্রীসের বিশেষত এথেন্‌সের জনগণ সোলোন ও ক্লাইসথিনিসের নায়কতায় দেশপ্রীতি ও প্রজাস্বাতন্ত্র্য বা ডিমোক্রেসির আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অচিরেই এথেন্‌সের প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ ও ইরানের সাম্রাজ্যিক আদর্শের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ উপস্থিত হল এবং সে সংঘর্ষ স্থায়ী হল প্রায় দু শো বছর (খ্রী পূ ৫০০-৩২৫)। বস্তুত এই সংঘর্ষের কাহিনীই গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান কথা। এই সংঘর্ষের প্রথম পর্বে ইরানের সাম্রাজ্যিক অভিযান প্রতিহত ও এথেন্‌সের প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ জয়ী হয়। কিন্তু বিজয়ী প্রজাতান্ত্রিক এথেন্‌সও কালক্রমে সাম্রাজ্যলিপ্সু হয়ে উঠল এবং সুবিখ্যাত পেরিক্লিসের অধিনায়কতায় একটি অনতিক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের অধিকারী হল। কিন্তু "নীচৈগচ্ছ্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ"। নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে গ্রীসের গৌরবকেন্দ্র এথেন্‌সের ভাগ্যবিপর্যয় এবং অর্ধসভ্য বলে অবজ্ঞাত প্রজাতন্ত্রলেশহীন মাকিদন রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটল। দুর্দান্তপ্রতাপ ফিলিপ ও তৎপুত্র বিশ্ববিজয়লিপ্সু আলেকজাণ্ডারের পদতলে এথেন্‌সের গৌরবচূড়া অবলুণ্ঠিত হল। অতঃপর আলেকজাণ্ডার সমগ্র গ্রীসে স্বীয়

আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে বিশাল পারসীক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয়াভিযানে অগ্রসর হলেন। পারস্যসাম্রাজ্য তখন পতনোন্মুখ, কাজেই আলেকজাণ্ডারের প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিরোধ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সামান্য আট বৎসরের (খ্রী পূ ৩৩৪-৩২৬) অভিযানের ফলেই সাইরিনি-মিশর থেকে গন্ধার-সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল পারস্যসাম্রাজ্য আলেকজাণ্ডারের করতলগত হল। অতঃপর তিনি সিন্ধুনদ পার হয়ে পঞ্জাবের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করে বিপাশা নদীর তীরে বিশাল মগধসাম্রাজ্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেন। কিন্তু মগধসাম্রাজ্যের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অগ্রসর না হয়ে বিপাশার তীর থেকেই প্রত্যাবৃত্ত হলেন। বাবিলনে পৌঁছার অত্যল্প কাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয় (খ্রী পূ ৩২৩)।

ইরান ও গ্রীসের আদর্শগত সংঘাতের এই যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল তার পরিণামটিও লক্ষ্য করার বিষয়। প্রায় দুইশত বৎসরব্যাপী সংঘাতের পরে ইরানসাম্রাজ্য গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের হাতে বিনাশ প্রাপ্ত হল। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, ইরান "মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই"। যে প্রজাস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ নিয়ে এথেন্সের অভ্যুদয়, দুই শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের পরে সে আদর্শ অন্তর্হিত হয়ে গেল। প্রজাতন্ত্রের আদর্শ ফিলিপ ও আলেকজাণ্ডারের চিত্তকে স্পর্শমাত্র করেনি। পক্ষান্তরে ইরানের যে সাম্রাজ্যিক আদর্শকে প্রতিহত করা ছিল এথেনস্ তথা গ্রীসের লক্ষ্য, কালক্রমে গ্রীস সেই আদর্শেরই উপাসক হয়ে উঠল। পেরিক্লিস, ফিলিপ, আলেকজাণ্ডার, প্রত্যেকেই দুর্দান্ত সাম্রাজ্যবাদী। কাজেই একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ইরান যেমন গ্রীসের বাহুবলের নিকট পরাজিত হল গ্রীসকেও তেমনি ইরানের দিগ্‌বিজয় ও সাম্রাজ্যবাদের আদর্শের নিকট পরাভব স্বীকার করতে হল। শুধু তাই নয়, ইরানবিজয়ের পর আলেকজাণ্ডার ইরানেই স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং বহুলপরিমাণে ইরানীয় রীতিনীতি

অবলম্বন করেন। বস্তুত এক্ষেত্রে বিজেতাকেই বিজিতের আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। ঐতিহাসিকগণ আলেকজাণ্ডারের ইরানবিজয়কে দারয়বৌষের গ্রীস আক্রমণের উলটো পরিণাম বলে বর্ণনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, কুরুষ্‌ ও দারয়বৌষ্‌ যে দিগ্‌বিজয় ও সাম্রাজ্যিক আদর্শের প্রবর্তক, আলেকজাণ্ডার সেই আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ এ হিসাবে আলেকজাণ্ডার কুরুষ্‌ ও দারয়বৌষের অনুবর্তী ও শিষ্যস্থানীয়। কিন্তু বিজয়গৌরবের বিচারে শিষ্য গুরুকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। দারয়বৌষের রাজ্যসীমার পূর্বে সমগ্র পঞ্জাব এবং পশ্চিমে সমগ্র গ্রীস আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু এই গৌরব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে অল্পকালের মধ্যেই তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে তাঁর তিনজন প্রধান সেনাপতির অধিকারভুক্ত হয়—সেলুকসের ভাগে এসিয়া মাইনর থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ, টলেমির ভাগে মিশর এবং এন্‌টিগোনাসের ভাগে মাকিদন। তা ছাড়া মিশরের পশ্চিমে সাইরিনিতে একটি নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মাকিদনের দক্ষিণে গ্রীস দেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

২

দেখা গেল প্রাকৃআর্য অসুর রাজগণ পশ্চিম এশিয়ায় যে দিগ্‌বিজয়-আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তীকালে ইরানীয় ও গ্রীক আর্যরা সেই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দুই শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে তৎকালীন ইতিহাসকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এই যে বহুশতবর্ষব্যাপী দিগ্‌বিজয়-নাট্য, তার ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চ ছিল ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তেই। শুধু

তাই নয়। কুরুষ্, দারয়বৌষ, আলেকজাণ্ডার প্রমুখ দিগ্জয়ী নেতাদের কীর্তিকলাপ ভারতসীমার বাইরে আবদ্ধ থাকেনি, অভ্যন্তরেও প্রবেশ করেছিল। এ অবস্থায় ওই যুগান্তব্যাপী দিগ্বিজয়মহিমা ভারতবর্ষের কল্পনাকেও উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, এ অনুমান অসংগত নয়। বস্তুত দারয়বৌষের প্রায় সমকালেই মগধনাথ বিম্বিসার ও অজাতশত্রু অঙ্গ ও লিচ্ছবিরাজ্য অধিকার করে যে জয়চক্র প্রবর্তন করেন সে চক্র দীর্ঘ দুই শতাব্দী কাল আবর্তিত হয়ে এবং প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে পরিক্রমণ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছিল। যে সময়ে আলেকজাণ্ডারের বিজয়াভিযান সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যকে গ্রাস করে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বিপাশার পশ্চিম তীরে উপনীত হল সে সময়ে মগধের বিজয়রথও সমগ্র উত্তর ভারত অতিক্রম করে বিপাশার পূর্বতীরে এসে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ ছিল। মগধ ও মাকিদনের এই দুই দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্য যদি বিপাশার পূর্ব বা পশ্চিম তীরে শক্তিপরীক্ষায় অগ্রসর হত তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসে কোন্ নব অধ্যায়ের সূচনা হত বলা যায় না। কিন্তু যে কারণেই হোক আলেকজাণ্ডার মগধরাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে অগ্রসর না হয়ে বিপাশাতীর থেকেই স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হলেন। কিন্তু মগধরাজশক্তি নিবৃত্ত হল না। মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খ্রী পূ ৩২৪-৩০০) অধিনায়কতায় মগধের বিজয়সেনা বিপাশা অতিক্রম করে ও আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিদের পর্যুদস্ত করে সমগ্র পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ অধিকার করে নিল। অতঃপর গ্রীস ও ভারতবর্ষের যে শক্তিপরীক্ষা বিপাশার তীরে আসন্ন হয়েও সংঘটিত হয়নি তা ঘটল সম্ভবত সিন্ধুনদের তীরে সেলুকস ও চন্দ্রগুপ্তের (খ্রী পূ ৩০৫) নায়কতায়। তার ফলাফল সুবিদিত। কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বালুচিস্থান, এই চারটি রাজ্য যবনসম্রাটের অধিকার থেকে মগধসম্রাটের অধিকারভুক্ত হল। এইভাবে মগধের দুই আঘাতের ফলে যবনসাম্রাজ্যের পশ্চিম

সীমা বিপাশার তীর থেকে হিরাটের প্রান্তে অপসারিত হল। ফলে যবনসম্রাট সেলুকস মগধসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতে বাধ্য হলেন। পূর্বেই বলেছি এ সময়ে যবনসাম্রাজ্যের পতনদশা। সুতরাং এ অবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত যদি তাঁর বিজয়বাহিনী নিয়ে আরও অগ্রসর হতেন তাহলে তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ করা কারও সাধ্য ছিল না এবং তাঁর পক্ষে মিশর-সাইরিনি ও গ্রীস-মাকিদন পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পূর্বতন সমগ্র ইরানসাম্রাজ্য ও তৎস্থলবর্তী যবনসাম্রাজ্য অধিকার করা হয়তো অসম্ভব হত না। কিন্তু তখনও সমগ্র ভারতবর্ষ বিজিত হয়নি। মহিষূরের দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য, কেরল, সত্যপুত্র ও তাম্রপর্ণী (সিংহল) তখনও অবিজিত এবং উত্তরে মগধের অনতিদূরেই প্রবল কলিঙ্গরাজ্য তখনও অক্ষুন্নশক্তিতে বিরাজমান ছিল। এই রাজ্যগুলিকে বশীভূত না করে এবং অচিরপ্রতিষ্ঠিত মৌর্যসাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন না করে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে বিশ্ববিজয়ে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ্ ছিল না। তাই তিনি দীর্ঘকাল সেলুকসের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করে চলতে বাধ্য হয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে স্বরাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন ও সমগ্র গ্রীসকে করায়ত্ত করতেই মাকিদনরাজ ফিলিপের জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছিল। তৎপুত্র আলেকজাণ্ডারও মাকিদন তথা গ্রীসকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেই তবে বিশ্ববিজয়ে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের পর তৎপুত্র বিন্দুসারের রাজত্বকালও (খ্রী পূ ৩০০-২৭৩) সম্ভবত বিদ্রোহদমন এবং স্বরাজ্যে শৃঙ্খলাবিধানেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাই তাঁর পক্ষেও যবনরাজাদের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করে চলার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর তৃতীয় মৌর্যসম্রাট অশোক (খৃ পূ ২৭৩-২৩২) যখন মগধের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন তখনই তাঁর পিতামহের আরব্ধ বিশ্ববিজয়ের ব্রতকে সম্পূর্ণতা দানের প্রথম সুযোগ এল। বিশ্ববিজয়লিপ্সু

অশোকের দৃষ্টি কলিঙ্গ-তাম্রপর্ণী থেকে মাকিদন-মিশর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের উপরে নিবদ্ধ ছিল। তাঁর প্রথম কর্তব্য হল কলিঙ্গ থেকে তাম্রপর্ণী পর্যন্ত ভারতবর্ষের অবিজিত রাজ্যগুলিকে মগধসাম্রাজ্যভুক্ত করা; অতঃপর পশ্চিমের গ্রীক রাজ্যগুলির পালা। স্বীয় রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে (খ্রী পূ ২৬০) অশোক তাঁর বিজয়াভিযান আরম্ভ করেন। কলিঙ্গ ছিল মগধের অনতিদূরে এবং তার শক্তিও নগণ্য ছিল না। তাই স্বভাবতই অশোক কলিঙ্গের বিরুদ্ধেই সর্বপ্রথমে অভিযান চালনা করলেন এবং প্রচণ্ড সংগ্রামের পর কলিঙ্গ রাজ্য পরাভূত ও অধিকৃত হল। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসবিধাতা এখানেই যবনিকাপাত করলেন। মৌর্যসম্রাট্‌গণের বিশ্ববিজয় নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যের পরেই অকস্মাৎ অকালেই নাট্যাভিনয় সমাপ্ত হয়ে গেল। অতঃপর যখন যবনিকা উঠল তখন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয়ের সূচনা দেখা গেল তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির; সে নাট্য শান্তরসের নাট্য, তাতে বীর্যের মহিমা ছিল, কিন্তু রৌদ্ররসের লেশমাত্রও ছিল না।

যাহোক, কলিঙ্গবিজয়ের পরেই ভারত-ইতিহাসের যে অধ্যায় সমাপ্ত হল তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বিম্বিসারের অঙ্গরাজ্য (আধুনিক ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা) জয়ের দ্বারা মগধের রাজনীতিতে যে দিগ্‌বিজয় ও রাজচক্রবর্তিত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সূচিত হল তা ক্রমবর্ধমান গতিতে হিরাট থেকে কামরূপ এবং কাশ্মীর থেকে মহিসুর পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে আত্মসাৎ করে অবশেষে অশোকের কলিঙ্গবিজয়ের পরেই সহসা চিরকালের জন্য শুব্ধ হয়ে গেল। মগধের রাজশক্তিকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের বন্ধনে সংহত করে তোলবার যে সাধনা আরম্ভ হয়েছিল বিম্বিসারের আমলে, অশোকের

আমলে তা যে শুধু অকালে অর্ধপথেই ক্ষান্ত হয়ে গেল তা নয়। তখন থেকেই তার বিপরীত গতিরও সূচনা হল এবং অশোকের অল্পকাল পরেই আবার 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত' ভারতের ইতিহাস আত্মকলহ ও বৈদেশিক আক্রমণের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল। তা ছাড়া, অসুরশক্তির কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত যে বিশ্ববিজয়ের মহিমা কুরুষ, দারয়বৌষ্‌ ও আলেকজাণ্ডারকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষের কল্পনাকেও উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল এবং সম্ভবত দিগ্‌বিজয়লিপ্সু চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপৌত্র অশোককেও পশ্চিমাভিযানে উন্মুখ করে তুলেছিল, কলিঙ্গবিজয়ের রক্তাক্ত বীভৎসতার মধ্যে সহসা তার অন্তর্ধান ঘটল। ফলে বিশ্বের সামরিক ও রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার যে সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল, ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে তেমন সুযোগ আর কখনও দেখা দেয়নি।

৩

কলিঙ্গবিজয়ের পরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে নবনাট্যের সূত্রপাত হল এবার তার স্বরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন। বিম্বিসারের অঙ্গবিজয় থেকে অশোকের কলিঙ্গবিজয় পর্যন্ত প্রায় তিনশো বছর ধরে মগধের রাজশক্তি যে নীতি অনুসরণ করছিল তাকে দিগ্‌বিজয়নীতি নামে অভিহিত করা হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে এই নীতির অপর নাম 'অসুর-বিজয়'।[১] দিগ্‌বিজয়ের আদর্শ মূলত অসুররাজগণের কাছ থেকেই আর্যরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিল, তা ছাড়া এই দিগ্‌বিজয়ের আনুষঙ্গিক নিষ্ঠুরতাও সামান্য ছিল না। সুতরাং অসুরবিজয় নামটি নিরর্থক নয়।

১ অর্থশাস্ত্র ১২।১।

মগধের দিগ্‌বিজয় বস্তুত অসুরবিজয়েরই প্রকারভেদ মাত্র এবং অশোকের কলিঙ্গযুদ্ধ এই অসুরবিজয়পর্বের শেষ দৃশ্য। এই যুদ্ধের আসুরিক নিষ্ঠুরতা অশোকের অন্তরে যে 'তীব্র অনুশোচনা' সঞ্চার করে, তার ফলেই তিনি মগধের তিন শতাব্দীব্যাপী দিগ্‌বিজয়নীতি চিরকালের জন্ম পরিহার করেন। এই আসুরিক দিগ্‌বিজয়নীতির পরিবর্তে তিনি যে নবনীতির প্রবর্তন করেন তাকে তিনি নিজেই 'ধর্মবিজয়' নামে অভিহিত করেছেন। দিগ্‌বিজয়ের মূলে নিষ্ঠুরতা ও হিংসা, ধর্মবিজয়ের মূলে মৈত্রী ও অহিংসা। দিগ্‌বিজয়ের লক্ষ্য বিশ্বসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, ধর্মবিজয়ের লক্ষ্য বিশ্বমৈত্রীপ্রতিষ্ঠা। কলিঙ্গযুদ্ধের পরে অশোক মৌর্যসাম্রাজ্যকে ধর্মবিজয় ও অহিংসা নীতির সহায়তায় বিশ্বমৈত্রীর লক্ষ্যের দিকেই পরিচালিত করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গ একটু পরেই পুনরুত্থাপন করা যাবে।

পূর্বে বলেছি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রায় একই সময় দুটি বিরুদ্ধ আদর্শের আবির্ভাব হয়, বিম্বিসার-অজাতশত্রুর অনুসৃত বিশ্ববিজয়ের আদর্শ এবং গৌতমবুদ্ধপ্রবর্তিত বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ। অঙ্গরাজ্যের সমরক্ষেত্রে বিম্বিসারের জয়চক্রপ্রবর্তন এবং সারনাথের পুণ্যক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের ধর্মচক্রপ্রবর্তন প্রায় একই সময়ের ঘটনা। মগধের রাজশক্তি স্বভাবতই প্রথম আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। কলিঙ্গযুদ্ধের সময় পর্যন্ত অশোক এই আদর্শেরই একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের পক্ষেও এই আদর্শের দুই অংশ—স্বদেশে রাষ্ট্রীয় ঐক্যস্থাপন এবং বিদেশে আধিপত্যপ্রতিষ্ঠা। এই প্রথম অংশ সমাপ্ত হবার পূর্বেই অশোক বিম্বিসারপ্রবর্তিত বিশ্বসাম্রাজ্যের আদর্শকে পরিত্যাগ করে বুদ্ধপ্রবর্তিত বিশ্বমৈত্রীর আদর্শকে স্বীকার করে নিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই যে আকস্মিক পটপরিবর্তন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার

তুলনা নেই। এই নীতিপরিবর্তনের সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। তার পূর্বে এই পরিবর্তনের স্বরূপটা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার। অশোক দিগ্‌বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের নীতি গ্রহণ করলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, 'বিজয়' শব্দটিকে তিনি অস্বীকার করলেন না। উভয় নীতিরই লক্ষ্য 'বিজয়'; পরিবর্তন ঘটল শুধু উদ্দেশ্য ও উপায়ের; সাম্রাজ্যের পরিবর্তে মানুষের চিত্ত অধিকার করা হল এই নব বিজয়নীতির উদ্দেশ্য এবং অস্ত্রের পরিবর্তে ধর্ম হল তার সাধন।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অশোকের এই নব বিজয়নীতির প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধেও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ কলিঙ্গযুদ্ধের পূর্বে দিগ্‌বিজয়লিপ্সু অশোকের দৃষ্টি যেসব দেশের উপরে নিবদ্ধ ছিল কলিঙ্গযুদ্ধের পরেও তিনি সেসব দেশকেই তাঁর ধর্মবিজয়নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র বলে গণ্য করলেন, অন্য কোনো দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। কোন্ কোন্ দেশ অশোকের ধর্মবিজয়ের লক্ষ্য ছিল তা জানা যায় তাঁর শিলালিপি (অশোক নিজে এগুলিকে অভিহিত করেছেন 'ধর্মলিপি' বলে) থেকেই। দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ পর্বতলিপিতে অশোকের ধর্মবিজিত দেশসমূহের তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকার দুইভাগ। এক ভাগে আছে মৌর্যসাম্রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত প্রত্যন্ত রাজ্যগুলির নাম —চোল (ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর), পাণ্ড্য (মাদুরা ও তিন্নেভেলি), সত্যপুত্র (উত্তর মালাবার), কেরলপুত্র (ত্রিবাঙ্কুর) এবং তাম্রপর্ণী (সিংহল); অশোকের ধর্মলিপিতে এসব রাজ্যের রাজাদের নাম নেই। দ্বিতীয় ভাগে আছে ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত প্রত্যন্ত যবননৃপতিদের নাম—অংতিয়োক (সিরিয়ারাজ এণ্টিয়োকস থিয়স, খ্রী পূ ২৬১-২৪৬), তুলময় (মিশররাজ টলেমি ফিলাডেলফস, খ্রী পূ ২৮৫-২৪৭),

অংতিকিন (মাকিদনরাজ এন্টিগোনস গোনেটস, খ্রী পূ ২৭৭-২৩৯), মগ (সাইরিনিরাজ মগস, খ্রী পূ ২৮৫-২৫৮) এবং অলিকসুদর (গ্রীসের অন্তর্গত করিন্থ বা এপিরাসের রাজা আলেকজাণ্ডার); অশোকের ধর্মলিপিতে এসব রাজাদের রাজ্যের নাম নেই। অশোক অত্যন্ত আত্মপ্রসাদের সঙ্গেই জানিয়েছেন, এসব দেশে তিনি ধর্মবিজয় লাভ করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর ধর্মনীতি এই সব রাজাদের রাজ্যে সাদরে স্বীকৃত হয়েছিল। উক্ত পর্বতলিপি থেকেই জানা যায়, ওসব দেশের জনসাধারণ অশোকের ধর্মানুশাসন সানন্দেই পালন করত এবং অশোকও ওসব দেশের জনসাধারণের কল্যাণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। অশোক তাঁর ভারতীয় ও অভারতীয় প্রত্যন্ত নৃপতিদের রাজ্যেও মানুষ এবং পশুর জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, মানুষ ও পশুর চিকিৎসার পক্ষে প্রয়োজনীয় ভেষজ লতাগুল্ম এবং ফলমূল যেখানে যা নেই সেখানে তা সংগ্রহ ও রোপণ করিয়েছিলেন, তা ছাড়া মানুষ এবং পশুর 'পরিভোগের' জন্যে পথে পথে কূপখনন এবং বৃক্ষরোপণাদির ব্যবস্থাও করেছিলেন। স্বদেশে এবং বিদেশে মানুষপশুনির্বিশেষে সর্বজীবের কল্যাণবিধানের এই যে আকাঙ্ক্ষা, এটাই অশোকের ধর্মবিজয়নীতির মূল প্রেরণা। এই নব বিজয়নীতি অনুসরণ করার ফলে বিশ্বব্যাপী জীবকল্যাণবিধানের সুযোগ পেয়ে অশোক যে পরম পরিতৃপ্তি ও 'প্রীতিরস' লাভ করেছিলেন সে কথা তাঁর ধর্মলিপিতে স্পষ্টভাষায় ঘোষিত হয়েছে।

দেখা গেল মহিশুর থেকে তাম্রপর্ণী পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারত এবং হিরাট থেকে মিশরের পশ্চিমে অবস্থিত সাইরিনি ও গ্রীসের পশ্চিম প্রান্তবর্তী এপিরাস পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে অশোকের ধর্মানুশাসন ও কল্যাণপ্রচেষ্টা প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। বস্তুত অশোক এই

উভয় ভূখণ্ডকেই স্বীয় ধর্মবিজিত সাম্রাজ্য বলে গণ্য করতেন এবং সে কথা ঘোষণা করে গর্ব অনুভব করতেন। হিরাট থেকে মহিষুর পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ছিল মৌর্যদের অস্ত্রবিজিত সাম্রাজ্য, আর মহিষুর থেকে তাম্রপর্ণী এবং হিরাট থেকে সাইরিনি-এপিরাস পর্যন্ত ভূভাগ ছিল অশোকের ধর্মবিজিত সাম্রাজ্য। অশোকের ধর্মসাম্রাজ্যের বহির্ভারতীয় অংশের ঐতিহাসিক সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক সংস্থান বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। আমরা দেখেছি ইরানসম্রাট্ কম্বুষ, উত্তর আফ্রিকার মিশর ও সাইরিনি রাজ্য অধিকার করেছিলেন এবং তৎপরে দারয়বৌষ য়ুরোপের অন্তর্গত গ্রীসের উত্তরসীমাবর্তী থ্রেস এবং মাকিদন জয় করেন। অতঃপর দারয়বৌষপুত্র খ্‌শয়ার্ষা (Xerxes, খ্রী পূ ৪৮৬-৪৬৫) সমগ্র গ্রীস দেশ অধিকার করতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁর সে উদ্যম ব্যর্থ হয়। পরবর্তী কালে দিগ্‌বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার থ্রেস-মাকিদন এবং মিশর-সাইরিনি সহ সমগ্র ইরানসাম্রাজ্যের উপরে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। তবে তাঁর সাম্রাজ্য দুইদিকে বর্ধিত হয়ে পশ্চিমে এপিরাস ও পূর্বে বিপাশা পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল। অতঃপর যখন মৌর্যবীরগণের পালা এল তখন তাঁরাও স্বভাবতই এই ভূখণ্ডের উপরেই স্বকীয় মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে উন্মুখ হলেন। বস্তুত অশোকের কীর্তিক্ষেত্রও ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত থেকে মিশর-সাইরিনি ও মাকিদন-এপিরাস পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। ইরান এবং মাকিদনের সম্রাট্গণের ন্যায় মৌর্যসম্রাট্ অশোকও বিশ্ববিজয়লিপ্সু ছিলেন। তফাত এই যে, অশোক তাঁর বিশ্ববিজয়প্রচেষ্টায় অস্ত্রের পরিবর্তে ধর্মকে, হিংসার পরিবর্তে অহিংসাকে এবং ক্রোধের বিনিময়ে অক্রোধকে আশ্রয় করলেন। এই বিজয়প্রচেষ্টায় অশোক দেশে দেশে রক্তপাতদক্ষ সশস্ত্র সৈন্যদল প্রেরণ করলেন না, প্রেরণ করলেন প্রবীণ ও সুশিক্ষিত ধর্মতত্ত্বজ্ঞ শান্তিদূতবাহিনী। বস্তুত

অশোককথিত ধর্মবিজয় হচ্ছে নৈতিক বিজয় এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মসাম্রাজ্য হচ্ছে মূলত নৈতিক আধিপত্য। অশোক যে ইরান, মাকিদন ও মগধের চিরন্তন দিগ্‌বিজয়নীতি পরিহার করে হিরাট থেকে সাইরিনি-এপিরাস পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের উপরে রাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের পরিবর্তে ধর্মসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হলেন, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আজও যথোচিতভাবে স্বীকৃত হয়নি। অশোক যদি কলিঙ্গযুদ্ধের পরে নরশোণিতপাতে বিমুখ না হয়ে তাঁর বিজয়বাহিনী নিয়ে সাইরিনি-এপিরাস পর্যন্ত অগ্রসর হতেন, তাহলে হয়তো তিনি দারয়বোষ্‌ ও আলেকজাণ্ডারের ন্যায় দুর্দান্ত অসুরবিজয়ী বীর বলে গণ্য হতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে খ্যাতির প্রতি দৃক্‌পাত না করে ধর্মবিজয়ী বীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, এ হিসাবে অশোকের কীর্তি অনন্যসাধারণ। পৃথিবীর ইতিহাসে অসুরবিজয়ী মহাবীরের অভাব নেই, কিন্তু ধর্মবিজয়ী বীর একমাত্র অশোক। অশোকের এই বিশিষ্টতা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে যে গৌরবের অধিকারী করেছে তার তুলনা নেই।

আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন দুর্দান্ত অসুরবিজয়ী রূপে। এই আসুরিক আক্রমণের প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের জনপদসমূহের উপরে যে ধ্বংস ও দুঃখদুর্দশার বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, ভারতবর্ষের স্মৃতিকে তা দীর্ঘকাল ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল সন্দেহ নেই। পরবর্তী কালে যবনদের আক্রমণে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে এক বিষম উপপ্লব সংঘটিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে এই যবনদের দুষ্টবিক্রান্তাঃ, যুদ্ধদুর্মদাঃ ও যুগদোষদুরাচারাঃ বলে নিন্দা করা হয়েছে। তাদের দ্বারা 'স্ত্রীণাং বালবধেনৈব' যে 'যুদ্ধং পরমদারুণম্‌' অনুষ্ঠিত হয় তার ফলে দেশের সমস্ত জনপদ বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল (আকুলা বিষয়াঃ সর্বে)।

স্ত্রী এবং বালহত্যাতেও যাদের দ্বিধা নেই তারা যে দুষ্টবিক্রান্ত ও যুগদোষদুরাচার তাতে সন্দেহ কি? আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরা যে এই সৈন্যদের চেয়ে ভিন্নপ্রকৃতির ছিল তা মনে করার হেতু নেই। বস্তুত গ্রীক সাহিত্যে আলেকজাণ্ডারের ভারতআক্রমণের যে বিবরণ পাওয়া যায় তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এই আক্রমণের নৃশংসতা পরবর্তী যবনআক্রমণের থেকে কিছুমাত্র কম ছিল না। তা ছাড়া কলিঙ্গযুদ্ধের যে নিষ্ঠুরতা অশোকের অন্তরে যুগান্তকারী অনুশোচনার সঞ্চার করেছিল, দিগ্‌বিজয়লিপ্সু মাকিদনীয় বাহিনীর নৃশংসতার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। অধিকন্তু এই নৃশংসতা বৈদেশিক আক্রমণকারীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়াতে ভারতবর্ষের চিত্তকে বিশেষভাবে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। বৈদেশিক অসুরবিজয়ীর এই নৃশংসতার কি প্রত্যুত্তর ভারতবর্ষ দিয়েছিল তাও বিবেচনা করে দেখা দরকার। মৌর্যবীর চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন বলের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করার এবং আঘাতের বিনিময়ে প্রত্যাঘাত দেবার পক্ষপাতী। আমরা দেখেছি তিনি দুই প্রচণ্ড আঘাতে যবনরাজ্যসীমাকে বিপাশাতীর থেকে হিরাটের পশ্চিমে সরিয়ে দেন এবং সম্ভব হলে মগধের বিজয়পতাকাকে মাকিদন পর্যন্ত নিয়ে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু অশোকের অবলম্বিত নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রপ্রকৃতির। সে নীতি হল—

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে

—ধর্ম্মপদ ১৭।৩

অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে এবং সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে জয় করবে।

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥

—ধর্ম্মপদ ১।৫

'বৈর দ্বারা বৈর কখনও প্রশমিত হয় না, অবৈর দ্বারাই বৈর প্রশমিত হয়, এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম।' অশোকের বিশ্ববিজয়প্রচেষ্টার মূলে ছিল এই সনাতন ধর্মের প্রেরণা। সে জন্যেই তিনি উক্ত বিজয়কে ধর্মবিজয় নামে অভিহিত করেন। শত্রুতার পরিবর্তে মৈত্রীদানই এই ধর্মবিজয়ের মূল কথা। এই দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে অশোকের ধর্মবিজয়কে আলেকজাণ্ডারের বিশ্ববিজয়ের, বিশেষভাবে পঞ্জাব ও সিন্ধু অধিকারের, ভারতীয় প্রত্যুত্তর বলেই গণ্য করতে হয় এবং অশোকের ধর্মসাম্রাজ্যকে আলেকজাণ্ডারের রাষ্ট্রসাম্রাজ্যের ভারতীয় প্রতিরূপ বলে স্বীকার করতে হয়। এই দিক্ থেকে বিচার করলে সহজেই বোঝা যাবে, অশোকের ধর্মবিজয়ের সীমা কেন আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যসীমাকে অতিক্রম করে যায়নি। মাকিদন সাম্রাজ্যের পশ্চিমসীমা ছিল একদিকে সাইরিনি, অপরদিকে এপিরাস। অশোকের ধর্মবিজয়ও সাইরিনি-এপিরাস পর্যন্ত গিয়েই নিরস্ত হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় বিবেচনার যোগ্য। তখনকার দিনে সাইরিনির পশ্চিমস্থ উত্তর আফ্রিকায় ছিল বিশাল কার্থেজ সাম্রাজ্য এবং এপিরাসের পশ্চিমে ছিল নবোদিত রোমক শক্তির সমগ্র ইতালিব্যাপী আধিপত্য। অশোক যে সময়ে কলিঙ্গবিজয় (খ্রী পূ ২৬১-৬০) সমাপ্ত করে যবনরাজ্যসমূহে ধর্মবিজয়নীতি প্রয়োগে ব্যাপৃত হন, সে সময়ে রোম ও কার্থেজ এক দীর্ঘস্থায়ী জীবনমরণ সংগ্রামে (খ্রী পূ ২৬৪-৪১) লিপ্ত ছিল। এই সংগ্রামের প্রচণ্ডতায় সাইরিনি ও এপিরাসের পশ্চিমস্থ সমগ্র ভূভাগ মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হচ্ছিল। এই অবস্থায় যুদ্ধোন্মত্ত কার্থেজ ও রোমক রাজ্যে ধর্মদূত পাঠিয়ে সাফল্য লাভের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। অশোকের ধর্মবিজয়প্রচেষ্টা যে সাইরিনি ও এপিরাসের পশ্চিমসীমা অতিক্রম করে আর অগ্রসর হয়নি, এটাও তার অন্যতম প্রধান কারণ হওয়া অসম্ভব নয়।

৪

অতঃপর অশোকের ধর্মবিজয়নীতির ফলাফল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। পূর্বে বলেছি অশোক তাঁর প্রত্যন্ত যবনরাজাদের রাজ্যে মানুষ ও পশুর চিকিৎসা এবং যেখানে যা নেই সেখানে সেসব ভেষজ লতাগুল্ম, ফলমূল ও বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর এই কার্যের ফলে ইরান তুর্কি সিরিয়া গ্রীস মিশর প্রভৃতি পশ্চিম দেশের উপর ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতি ও ঔষধাবলীব কতখানি প্রভাব পড়েছিল এবং কোন্ কোন্ লতাগুল্ম, ফলমূল ও বৃক্ষ ভারতবর্ষ থেকে সেসব দেশে গিয়েছে অথবা সেসব দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছে, এ বিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এদেশের চিকিৎসা, ওষুধ এবং গাছপালার নামও নিশ্চয়ই বাইরে গিয়েছিল এবং সেসব দেশের নামও এদেশে এসেছিল; এসব নামের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাও কম ঔৎসুক্যের বিষয় নয়। ইরানসম্রাট্ কুরুষেব আমল থেকেই পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ স্থাপিত হয়। আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়ের ফলে সে যোগপথ আরও প্রশস্ত হয়। এই সংযোগপথে ভারতবর্ষ ও বহির্জগতের মধ্যে শুধু যে পণ্যদ্রব্যেরই আদানপ্রদান হত তা নয়, ভাবের আদানপ্রদানও চলত। অশোকের ধর্মবিজয়প্রচেষ্টার ফলে স্বভাবতই এই আদানপ্রদানের গতি খরতর এবং পাশ্চাত্ত্য জগতের উপর ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব গভীরতর হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের নীতি ও ধর্মগত আদর্শ অশোকের বহির্ভারতীয় ধর্মানুশাসনের ফলে কি ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল সে বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধান হয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন খ্রীষ্টান ধর্মের (বিশেষত এ ধর্মের Manichaean শাখার) উপর যে বৌদ্ধ

প্রভাব দেখা যায় তা প্রধানত অশোকের ধর্মপ্রচেষ্টারই ফল। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার আরও যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু সে কথা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের চিন্তনীয় বিষয় হচ্ছে, অশোক যে তাঁর প্রত্যন্ত যবনরাজ্যসমূহে অবৈর, অক্রোধ, শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করলেন সেসব দেশের জনসাধারণ তা কি ভাবে গ্রহণ করল। বলা বাহুল্য এই অবৈর ও মৈত্রীর বাণী অশোকের প্রতিবাসী যবননৃপতিদের হৃদয় স্পর্শ করেনি। গ্রীসের ইতিহাস চিরকালই আত্মকলহের ইতিহাস। অশোকের শান্তিবাণী সে কলহকে কিছুমাত্র প্রশমিত করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, সে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী ভারতভূমির প্রতি যবনদের লুব্ধ আগ্রহকেও সংযত করতে পারেনি। অবশ্য অশোকের জীবিতকালে ভারতবর্ষের প্রতি হস্তপ্রসারণ করতে কারও সাহস হয়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই রাজধানী পাটলিপুত্র পর্যন্ত সমস্ত উত্তরভারত যবন-আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। বস্তুত এই যবন-আক্রমণ মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

অশোকের ধর্মবিজয়ের আদর্শ পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে কি ভাবে গৃহীত হয়েছিল সে বিষয়েও একটু আলোচনা করা কর্তব্য। এই ধর্মবিজয়-আদর্শের দুটি দিক্। অসুরবিজয় বা দিগ্‌বিজয় আকাঙ্ক্ষায় পররাজ্য আক্রমণ (অশোকের ভাষায় 'শরশক্য' বিজয়) পরিহার এবং স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে মানুষপশুনির্বিশেষে সকলের কল্যাণসাধনের নীতিগ্রহণ। অশোক যে শুধু নিজেই পররাজ্য অধিকারের ইচ্ছা ত্যাগ করেছিলেন তা নয়, উত্তরকালে তাঁর পুত্রপ্রপৌত্রেরাও নবরাজ্য বিজয়ের বাসনা না করেন এ ইচ্ছাও তিনি শিলালিপিতে প্রকাশ করে গিয়েছেন।[১] কিন্তু মনে রাখা

১ পুত্র পপোত্র মে অহু নবং বিজয়ং ম বিজেতবিয়ং মঞিসু, ১৩শ পর্বতলিপি।

উচিত যে, অশোক পররাজ্যবিজয়েরই বিরোধী ছিলেন, যুদ্ধমাত্রকেই তিনি গর্হিত মনে করতেন না। স্বরাজ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবা তাঁর মতে অন্যায় নয়। শত্রুর আক্রমণ থেকে রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী সৈন্যদল প্রস্তুত রাখতেন, এ রকম অনুমান করার হেতু আছে। অশোক তাঁর অবিজিত প্রত্যন্তবাসীদের লক্ষ্য করে একাধিকবার জানিয়েছেন, কলিঙ্গবাসীরা তাঁর কাছ থেকে যে দুঃখবেদনা পেয়েছে তার জন্য তিনি অনুতপ্ত এবং অন্য কোনো জনপদবাসীকে এর শতভাগ এমন কি সহস্রভাগ দুঃখ দিতেও তিনি পরাঙ্মুখ। তিনি তাদের এ আশ্বাসও দিয়েছেন যে, তারা তাঁর কাছ থেকে সুখ বই দুঃখ পাবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের সতর্ক কবে দিয়েছেন, তারা যদি তাঁর সাম্রাজ্যের বা প্রজাদের কোনো 'অপকার' করে এবং তা যদি ক্ষমার অযোগ্য হয় তাহলে তিনি তা সহ্য করবেন না, আর কলিঙ্গ যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হলেও উক্তপ্রকার অপকারক অর্থাৎ আক্রমণকারীদের শাস্তি দেবার মতো ক্ষমতা তাঁর আছে।[২] পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের আর কোনো রাজাই অশোকের অনুসৃত এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের আদর্শকে স্বীকার করেছিলেন কি না সন্দেহ। কনিষ্ক এবং হর্ষবর্ধনের ন্যায় বৌদ্ধধর্মানুরাগী রাজারাও পররাজ্য আক্রমণ করে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। অশোক অস্ত্রবলে পররাজ্য অধিকারের বিরোধী, কিন্তু ধর্মবলে পররাজ্যে নৈতিক আধিপত্য স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা দেখলাম অশোকের এই আদর্শের প্রথমাংশের প্রতি পরবর্তী কোনো রাজারই আগ্রহ ছিল না, বলা বাহুল্য দ্বিতীয়াংশের প্রতিও কারও আগ্রহ ছিল এমন প্রমাণ ইতিহাসে নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরবর্তী কালে এই দুই অংশের মধ্যে একটা সমন্বয় স্থাপনের প্রয়াস

---

২ অনুতপে পি চ প্রভাবে দেবনং প্রিয়স, ১৩শ পর্বতলিপি।

ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (এই গ্রন্থের বর্তমান রূপ মৌর্যযুগের পরবর্তী বলেই স্বীকার্য) বলা হয়েছে, যে বিজয়ী বিজিতের ভূমিদ্রব্যাদি সম্পদ্ গ্রহণ করেন না, তাঁর বশ্যতা স্বীকারেই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁকেই বলা যায় 'ধর্মবিজয়ী' (পৃ ৩১২-১৩, ৩৮২)। রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে কালিদাস এক জায়গায় বলেছেন,

গৃহীতপ্রতিমুক্তস্য স ধর্মবিজয়ী নৃপঃ।
শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার ন তু মেদিনীম্॥

—রঘুবংশ ৪।৪৩

'ধর্মবিজয়ী' রাজা রঘু মহেন্দ্রনাথকে প্রথমে বন্দী করে ও পরে মুক্তি দিয়ে তাঁর শ্রী অর্থাৎ যশই হরণ করলেন, মেদিনী অর্থাৎ ভূমি হরণ করলেন না। লক্ষ্য করবার বিষয়, রঘুকে যুগপৎ দিগ্‌বিজয়ী ও ধর্মবিজয়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কালিদাস দিগ্‌বিজয় ও ধর্মবিজয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ কল্পনা করেননি। এই ধর্মবিজয়ও দিগ্‌বিজয়ের মতোই শরশক্য অর্থাৎ অস্ত্রলভ্য। অথচ অশোক শরশক্য দিগ্‌বিজয়ের প্রতিকল্প হিসাবেই ধর্মবিজয়ের নব আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। রঘুব ধর্মবিজয়ের আদর্শকে কালিদাসের কল্পনামাত্র বলে মনে করার হেতু নেই। ইতিহাসেও এরকম ধর্মবিজয়ের দৃষ্টান্ত আছে। ঐতিহাসিকদের মতে কালিদাস গুপ্তসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৮০-৪১৪) সমকালীন। এই চন্দ্রগুপ্তের পিতা সমুদ্রগুপ্ত একজন পরাক্রান্ত দিগ্‌বিজয়ী বীর। তিনি আর্যাবর্তের বহু রাজাকে সমূলে উচ্ছেদ করে তাঁদের ভূমি স্বরাজ্যভুক্ত করেন এবং এজন্য তিনি 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' নামে অভিহিত হয়েছেন তাঁর প্রশস্তিতে। সুতরাং অর্থশাস্ত্রের বিধান অনুসারে তাঁকে অসুরবিজয়ী বলা যেতে পারে। কিন্তু দক্ষিণাপথে তিনি যেসব রাজাকে পরাভূত করেন তাঁদের যশ হরণ করেই

তিনি তুষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের ভূমি তিনি তাঁদেরই প্রত্যর্পণ করেন। এক্ষেত্রে তাঁকে কালিদাসের রঘুর ন্যায়ই ধর্মবিজয়ী বলে অভিহিত করা যায়। এপ্রসঙ্গে আলেকজাণ্ডারকর্তৃক পুরুর রাজ্যপ্রত্যর্পণের কথাও স্মরণীয়। যাহোক, সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন একাধারে অসুরবিজয়ী এবং ধর্মবি[illegible]। অশোকের আদর্শে অসুরবিজয় বা দিগ্‌বিজয়ের সঙ্গে ধর্মবিজয়ের এরকম সমন্বয় একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া তাঁর আদর্শের বিচারে রঘু বা সমুদ্রগুপ্তের ধর্মবিজয়, ধর্মবিজয় নামে স্বীকার্যই নয়।

৫

অশোকের ধর্মবিজয়-আদর্শের এই রূপ- ও অর্থ-পরিবর্তনের হেতু কি তাও বিবেচ্য। একথা মনে করার হেতু আছে যে, বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের সংগ্রামবিমুখ মনোভাব ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রসন্নতা অর্জন করতে পারেনি। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করেছি, এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এই ব্রাহ্মণ্য সমাজ অশোকের যুদ্ধবিমুখ মনোভাবকে স্বীকার করতে পারেনি, যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ভারতবর্ষের চিরন্তন রাজকীয় ও ক্ষাত্র আদর্শের বিরোধী; অথচ অশোকের ধর্মবিজয়ের মহৎ ভাবটিকে একেবারে অস্বীকার করাও চলে না। তাই ধর্মবিজয়ের উক্তপ্রকার রূপ- ও অর্থ-পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল বলে মনে হয়। একথা মনে করার পক্ষে অন্যতম যুক্তি এই যে, অশোকের অহিংসার আদর্শকেও ব্রাহ্মণ্য সমাজ নিজেদের অনুকূলে রূপান্তরিত করে নিয়েছিল এমন প্রমাণ আছে।

অশোকের স্বীকৃত অহিংসা ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের অহিংসার পার্থক্য বিচার করে দেখা যাক। স্বীয় প্রজাদের প্রতি অশোকের সর্বপ্রথম অনুশাসন হচ্ছে,

ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজূহিতয়ং।

'এখানে (অর্থাৎ আমার সাম্রাজ্যে) কোনো জীব বধ করে যজ্ঞ করবে না।' অশোক আহারের জন্যে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে জীবহত্যার বিরোধী ছিলেন না, তিনি শুধু অকারণ জীবহত্যারই বিরোধী ছিলেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর অনুশাসনগুলিতেই। অবশ্য তিনি নিজে প্রাণিবধ নিবারণের উদ্দেশ্যে আমিষভোজন ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর এই আদর্শে অন্যেরাও অনুপ্রাণিত হতে পারে সম্ভবত এই আশাতেই তিনি নিজের আমিষত্যাগের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। তাছাড়া বৎসরের মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট দিনে জীবহত্যা অবাঞ্ছনীয় বলেও ঘোষণা করেছিলেন। তিনি আহারার্থ প্রাণিবধের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে কোনো নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেননি। কিন্তু যজ্ঞার্থ জীবহত্যার বিরুদ্ধে তাঁর অনুশাসন সুস্পষ্ট। এই যজ্ঞবিরোধী অনুশাসন স্বভাবতই ব্রাহ্মণ্য সমাজের পক্ষে প্রীতিকর ছিল না।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, গৌতম বুদ্ধ নিজেও আমিষভোজনের বিরোধী ছিলেন না তার প্রমাণ আছে বৌদ্ধ সাহিত্যেই। কিন্তু তিনি যে পশুঘাতমূলক যজ্ঞবিধির বিরোধী ছিলেন, সে কথা জয়দেবের দশাবতারস্তোত্র থেকেও জানা যায়।

যা হোক, ব্রাহ্মণ্য সমাজ যে অশোকের যজ্ঞবিরোধী অনুশাসনকে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করেননি তার প্রমাণ আছে ইতিহাসেই। অশোকের মৃত্যুর মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে শেষ মৌর্যরাজা বৃহদ্রথের ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ প্রভুকে নিহত করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন (খ্রী-পূ ১৮৭-১৫১)। নবরাজ্যাধিকার ও পশুহত্যামূলক যজ্ঞ, এই উভয় বিষয়েই তিনি অশোকের নীতির প্রতি কোনো শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করেননি। যবনবিজয় ও অন্যান্য রাজ্যবিজয়ের উৎসব হিসাবে তিনি অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্রনগরে এবং সম্ভবত তাঁর রাজপ্রাসাদেই দুটি অশ্বমেধ

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য তিনি ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাছে যথেষ্ট অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ এবং এই যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলি। হরিবংশে বলা হয়েছে,

ঔদ্ভিজ্জো ভবিতা কশ্চিৎ সেনানীঃ কাশ্যপো দ্বিজঃ।
অশ্বমেধং কলিযুগে পুনঃ প্রত্যাহরিষ্যতি॥

—ভবিষ্যপর্ব ২।৪০

এই একটিমাত্র বাক্যেই তৎকালীন ব্রাহ্মণসমাজের অভিনন্দনবাণী ধ্বনিত হচ্ছে। কাশ্যপো দ্বিজঃ এবং পুনঃপ্রত্যাহরিষ্যতি, এই কথা দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অশোক পশুঘাতমূলক যজ্ঞমাত্রেরই বিরোধী ছিলেন। সুতরাং অশ্বমেধও যে তাঁর মতে নিন্দনীয় ছিল তা বলাই বাহুল্য। নতুবা তিনি নিজেও ভারতীয় চিরন্তন রীতি অনুসারে কলিঙ্গযুদ্ধের পর অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের দ্বারা বিজয়োৎসব সম্পন্ন করতে পারতেন এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজ স্বভাবতই এই প্রত্যাশাই করেছিল বলে মনে করা যায়। কিন্তু তিনি নিজে তো অশ্বমেধ করলেনই না, পরন্তু তাঁর রাজ্যে (অর্থাৎ ভারতবর্ষেই) সর্বপ্রকার জীবহত্যামূলক যজ্ঞানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হল। এই নিষেধ থেকেই বোঝা যায় তৎকালেও উক্তপ্রকার যজ্ঞের প্রচলন ছিল; অশোকের আমলেই তা বন্ধ হল। সুতরাং 'কাশ্যপো দ্বিজঃ অশ্বমেধং পুনঃপ্রত্যাহরিষ্যতি' কথার বিশেষ সার্থকতা আছে। এই প্রসঙ্গে যদি স্মরণ করা যায় যে, বৌদ্ধ সাহিত্যে পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধধর্মবিরোধী বলে মনে করা হয়েছে, তাহলে পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধকে অশোকের যজ্ঞবিরোধী অনুশাসনের প্রত্যুত্তর বলে গ্রহণ করতে কোনো বাধ থাকে না। ভারহুতের বৌদ্ধ স্তূপ শুঙ্গবংশের রাজত্বকালেই নির্মিত হয় এবং সে কথা স্তূপগাত্রেই লিখিত আছে। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলেন, শুঙ্গরাজারা বৌদ্ধধর্মবিরোধী হলে তাঁদের রাজত্বকালে ভারহুতের স্তূপ নির্মিত হতে পারত না। কিন্তু

অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ না করেও উক্ত ধর্মের নীতিবিরোধী কার্যে উৎসাহ প্রকাশ করা যায়, এবং এরকম উৎসাহ উক্ত সম্প্রদায়ের পরোক্ষ বিরোধিতা বলে গণ্য হতে পারে। অশোকের অনুশাসন থেকে জানা যায়, তিনি নিজে ব্রাহ্মণদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন এবং সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলকেই অনুরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করতে পুনঃপুন অনুজ্ঞা জানিয়েছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি স্বীয় রাজ্যে জীবহিংসামূলক যজ্ঞানুষ্ঠান নিষেধ করেছিলেন। এই নিষেধানুশাসন স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরোক্ষ বিরোধিতা বলে গণ্য হতে পারে। এই দিক্ থেকে বিচার করলে ভারহুতের স্তূপ নির্মাণে বাধা না দেওয়া সত্ত্বেও পুষ্যমিত্রের যজ্ঞানুষ্ঠানকে অশোকের যজ্ঞবিরোধী অনুশাসনের প্রত্যুত্তর বলেই স্বীকার করতে হয়। বস্তুত অশোকের নীতি ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতিকূলে এবং পুষ্যমিত্রের নীতি ছিল উক্ত সমাজের অনুকূলে, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

পুষ্যমিত্রের পর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হিসাবে দাক্ষিণাপথের সাতবাহন সম্রাট্ শাতকর্ণির (আনুমানিক খ্রী পূ ২৫-১) নাম উল্লেখযোগ্য। শুঙ্গদের ন্যায় সাতবাহনরাও ব্রাহ্মণ এবং শাতকর্ণি নিজে ব্রাহ্মণত্বের গর্বে গর্বিতও ছিলেন। সাতবাহন বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমীপুত্রও (খ্রী ১০৬-১৩০) সমাজের চতুর্বর্ণবিভাগের সংরক্ষক, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থক ও 'ক্ষত্রিয়দর্পমানমর্দন' বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। যাহোক, এই গর্বিত ব্রাহ্মণবংশীয় সম্রাটের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের পরিচায়ক, একথা বোধ করি নিঃসংশয়েই বলা চলে। অতঃপর সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন না; কিন্তু তিনি যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান যে সে-ধর্মের জয় ঘোষণা করেছিল, একথা ঐতিহাসিকরা একবাক্যে স্বীকার করেন।

দেখা গেল অশোকের বৌদ্ধধর্মসম্মত যজ্ঞবিরোধী অনুশাসন ব্রাহ্মণ্য সমাজের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। ফলে উত্তরকালে এই অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং এই প্রতিক্রিয়ার নায়ক ছিলেন শুঙ্গ সাতবাহন প্রভৃতি ব্রাহ্মণবংশীয় রাজারা। শুধু যে মৌর্যোত্তর যুগের ঐতিহাসিক ঘটনা থেকেই এই প্রতিক্রিয়ার কথা অনুমিত হয় তা নয়। তৎকালীন সাহিত্যেও এই প্রতিক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়। অশোকের অনুশাসনের সঙ্গে মহাভারতীয় ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের তুলনা করলেই একথার সার্থকতা বোঝা যাবে। আমরা দেখেছি অশোকের মতে নিরামিষভোজন প্রশংসনীয় হলেও তাঁর অনুশাসনে আমিষাহার নিষিদ্ধ হয়নি, কিন্তু অশ্বমেধ প্রভৃতি জীবহত্যামূলক যজ্ঞের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে যজ্ঞার্থ পশুবধই যথার্থ হিংসা এবং এরকম পশুবধ থেকে বিরত থাকাই অহিংসা, আহারার্থ পশুবধকে তিনি যজ্ঞে জীবহত্যার ন্যায় দূষণীয় মনে করতেন না। ব্রাহ্মণ্য সমাজও (ধর্মবিজয় আদর্শের ন্যায়) অহিংসার আদর্শকে স্বীকার করে নিল, কিন্তু তার ব্যাখ্যা করল অন্য রকম। মহাভারতে অহিংসার অজস্র প্রশংসা আছে। এখানে একটিমাত্র উক্তি উদ্ধৃত করছি।

অহিংসা পরমো ধর্মস্তথাহিংসা পরং তপঃ।
অহিংসা পরমং সত্যং যতো ধর্মঃ প্রবর্ততে॥

—অনুশাসন পর্ব ১১৫।২৫

কিন্তু এই বহুপ্রশংসিত অহিংসার স্বরূপ কি? এই অহিংসা হচ্ছে মাংসভক্ষণবিরতি, পশুবধমূলক যজ্ঞবিরতি নয়

মাসি মাস্যশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
ন খাদতি চ যো মাংসং সমমেতন্মতং মম॥

—অনুশাসন পর্ব ১১৫।১৬

'শত বৎসর মাসে মাসে অশ্বমেধ করার যে ফল, একমাত্র মাংসাহার ত্যাগ করলেই সে ফল পাওয়া যায়।' আপাতত মনে হয় অশ্বমেধ প্রভৃতি হিংসামূলক যজ্ঞবিরতির পক্ষে উৎসাহদানই এই উক্তির উদ্দেশ্য। কিন্তু একটু পরেই বলা হয়েছে, অপ্রোক্ষিতং বৃথামাংসং বিধিহীনং ন ভক্ষয়েৎ— যজ্ঞার্থ মন্ত্রসংস্কৃত না করে বৃথামাংস ভক্ষণ করা অবৈধ। মনুসংহিতাতেও (৫।২৭) বলা হয়েছে, প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্ মাংসম্। অনুশাসন পর্বে ওই প্রসঙ্গেই আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—

বিধিনা বেদদৃষ্টেন তদ্‌ভুক্তেহ ন দুষ্যতি।
যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা ইত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ॥

—অনুশাসনপর্ব ১১৬।১৪

শুধু তাই নয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মৃগয়ালব্ধ আরণ্য পশুর মাংস ভক্ষণের বিধান দেওয়া হয়েছে।

বীর্যেণোপার্জিতং মাংসং যথা ভুঞ্জন্ ন দুষ্যতি।...
অতো রাজর্ষয়ঃ সর্বে মৃগয়াং যান্তি ভারত।
ন হি লিপ্যন্তি পাপেন ন চৈতৎ পাতকং বিদুঃ॥

—অনুশাসন পর্ব ১১৬।১৫-১৯

অশোকের অনুশাসনের সঙ্গে এই ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনেব পার্থক্য সুস্পষ্ট। অশোকের মতে মাংসভোজন প্রশংসনীয় না হলেও অবৈধ নয়, কিন্তু যজ্ঞার্থ পশুহনন অবৈধ এবং তিনি যে মৃগয়ারও বিরোধী ছিলেন সেকথা তাঁর শিলালিপিতেই আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য বিধান মতে অহিংসা (অর্থাৎ মাংস-ভক্ষণবিরতি) পরম ধর্ম, কিন্তু যজ্ঞ- বা মৃগয়া-লব্ধ মাংস ভোজনে কিছুমাত্র দোষ নেই।

ব্রাহ্মণদের এই বিধান যে শুধু পুথিগত তা নয়, সমাজ যে কার্যতও এই বিধান মেনে চলত তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত

বিক্রমাদিত্যের সময় চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ান ভারতভ্রমণ (খ্রী ৪০১-১০) করে যে বিবরণ লিখে গিয়েছেন তার থেকে জানা যায় তৎকালে চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ ব্যতীত উচ্চবর্ণের মধ্যে মাংসাহার প্রচলিত ছিল না, এ বৈশিষ্ট্য বর্তমান সময় পর্যন্ত চলে এসেছে। বলা বাহুল্য অশোকের প্রেরণা এবং ব্রাহ্মণ্য বিধানে অহিংসার অজস্র প্রশংসার ফলেই ভারতবর্ষ থেকে আমিষ ভোজনের রীতি লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু গুপ্ত-যুগে অর্থাৎ ফা হিয়ানের সময়ে যজ্ঞার্থ পশুহত্যা প্রশংসনীয়ই ছিল। তার প্রমাণ সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁর পৌত্র কুমারগুপ্তের অশ্বমেধ অনুষ্ঠান। এর দ্বারা অশোকের অনুশাসনের ব্যর্থতা এবং ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের জয় সূচিত হচ্ছে। মৃগয়া সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। অশোক মৃগয়ার্থ বিহারযাত্রা ত্যাগ করে ধর্মযাত্রার রীতি গ্রহণ করেন। তাঁর এই আদর্শ যে ক্ষত্রিয়সমাজের চিত্ত স্পর্শ করেনি তার প্রমাণ কালিদাসের রচনায় মৃগয়ার প্রশংসা এবং গুপ্ত-যুগের স্বর্ণমুদ্রায় মৃগয়াবিহারী সম্রাট্‌কর্তৃক পশুহত্যার চিত্র।

এ প্রসঙ্গে বলা কর্তব্য, বুদ্ধ এবং অশোকের পশুঘাতমূলক যজ্ঞনিন্দা যে ব্রাহ্মণ্য সমাজে কারও সমর্থনই লাভ করতে পারেনি তা নয়। উপনিষদের সময় থেকেই যজ্ঞে পশুহত্যার নিষ্ঠুরতা অনেকের চিত্তে যজ্ঞবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করছিল। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহাভারতেও নানাস্থানে স্পষ্টতই যজ্ঞে পশুহত্যার বা পশুহত্যামূলক যজ্ঞের নিন্দা করা হয়েছে। তন্মধ্যে শান্তিপর্বের অন্তর্গত 'উঞ্ছবৃত্ত্যাখ্যান' নামক যজ্ঞনিন্দামূলক অধ্যায়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অধ্যায়টিতে যজ্ঞার্থ পশুহত্যা সর্বথা নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়েছে। কোনো কোনো বিষয়ে অশোকের অনুশাসনের সঙ্গে এই অধ্যায়ের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। অশোকের অনুশাসনে 'অহিংসা' শব্দটির প্রয়োগ নেই। জীবহিংসা অর্থে 'ভূতানং বিহিংসা' কথার প্রয়োগই দেখা

যায়। চতুর্থ গিরিলিপিতে 'ভূতানং বিহিংসা'র 'সঙ্গে ভূতনাং অবিহিংসা কথারও প্রয়োগ হয়েছে। মহাভারতের এই অধ্যায়টিতেও ঠিক এই অর্থে 'সর্বভূতাবিহিংসা' কথাটির ব্যবহার হয়েছে। এই চতুর্থ গিরিলিপিতেই 'বিমানদসনা' বলে 'দিব্য রূপ'এর কথা আছে এবং কথাটির ঠিক অর্থ কি তা স্পষ্ট নয়। মহাভারতের এই অধ্যায়টিতেও দিব্য (অর্থাৎ স্বর্গীয়) বিমান দর্শনের কথা আছে। এই অধ্যায়টির সাহায্যে উক্ত 'বিমানদসনা' কথার অর্থ নিরূপণ করা সহজ হতে পারে। কিন্তু সে গবেষণা এস্থলে আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। যাহোক, এই অধ্যায়ে হিংসাপ্রধান যজ্ঞের প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সেটা ব্যতিক্রম মাত্র। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে এরকম মনোভাবের দৃষ্টান্ত বিরল। যজ্ঞে পশুহত্যার অনুকূল মনোভাবই ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে প্রবল।

দেখা গেল গৌতম বুদ্ধ ও অশোকের অনুসৃত অহিংসানীতি ব্রাহ্মণ্য সমাজে উপেক্ষিত হয়নি, কিন্তু ব্রাহ্মণরা হিংসাপ্রধান যজ্ঞের বৈধতাকে অব্যাহত রেখে শব্দটিকে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন। ধর্মবিজয় সম্বন্ধেও ঠিক তাই ঘটেছে। পরবর্তী রাজারা ধর্মবিজয় কথাটিকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু অশোকের স্বীকৃত ব্যাখ্যাও গ্রহণ করেননি,; ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারগণ যশোলিপ্সু রাজাদের অনুকূলে শব্দটিকে নূতন অর্থে উপস্থাপিত করেন। তথাপি এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, অশোকের ধর্মবিজয় ও অবিহিংসা নীতি উত্তরকালে নূতনভাবে ব্যাখ্যাত হলেও এই দুটি নীতি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

অহিংসা ও রাজনীতি

১

অহিংসার ভাব ও আদর্শটি হচ্ছে বিশেষভাবে ভারতীয়। অন্য কোনো দেশের রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনে এই আদর্শটির এ-রকম প্রবল প্রভাব দেখা যায় না। ভারতবর্ষেও আজকাল আমাদের চিন্তাজগতে এই আদর্শটি যে-রকম প্রাধান্য লাভ করেছে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আর কখনও সে-রকম হয়েছে বলে মনে হয় না। এই যে অহিংসার আদর্শটি আজকাল আমাদের জাতীয় জীবনকে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করছে এটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগে যুগে কিরূপে বিবর্তিত হয়েছে, প্রথমে তারই একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

অহিংসার আদর্শটি অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছিল একটি ধর্মনীতিরূপে এবং বেদবিরোধী ধর্মআন্দোলন বা ধর্মসংস্কারের একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে। উপনিষদের যুগেই এই সংস্কার-আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয়। পরবর্তীকালে ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব), জৈন এবং বৌদ্ধ, এই তিনটি সাম্প্রদায়িক ধর্মকে আশ্রয় করে এই আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অনুষ্ঠানবহুল বৈদিক ধর্মের, বিশেষত পশুহিংসাময় যাগযজ্ঞের, বিরুদ্ধে প্রতিবাদজ্ঞাপন। উপনিষদের যুগে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত না হলেও ওই সময়েই যে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞধর্মকে গৌণতা দান করে জ্ঞান ও চারিত্রনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৭) যজ্ঞের যে রূপকার্থ করা হয়েছে তাতেই ক্রিয়াময় বা দ্রব্যময় যজ্ঞের ব্যর্থতা অত্যন্ত নিঃসংশয়রূপে স্বীকৃত ও ঘোষিত হয়েছে। ওই উপনিষদে মানুষের সমগ্র জীবনটাকেই

একটি যজ্ঞরূপে গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই জীবনযজ্ঞ উক্ত গ্রন্থে 'পুরুষযজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়েছে। যাহোক, মানুষের জীবনরূপ যজ্ঞের দক্ষিণার যে রূপকার্থ করা হয়েছে সেইটেই সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়। বেদবিহিত যজ্ঞের দক্ষিণা হল পুরোহিতকে অর্থদান। কিন্তু পুরুষযজ্ঞ বা জীবনযজ্ঞের দক্ষিণা হচ্ছে কয়েকটি চারিত্রনীতি : তপস্যা, দান, ঋজুতা, অহিংসা এবং সত্যবচন।

অথ যত্তপোদানমার্জবমহিংসাসত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।

—ছান্দোগ্য ৩।১৭।৪

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আধুনিক কালে যেমন অহিংসা ও সত্যাগ্রহ পাশাপাশি চলে, ছান্দোগ্য উপনিষদেও তেমনি অহিংসা ও সত্যবচন পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে।

এই উপনিষদুক্ত পুরুষযজ্ঞের যিনি উপদেষ্টা তাঁর নাম হচ্ছে ঘোর আঙ্গিরস এবং যাঁকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তাঁর নাম দেবকীপুত্র কৃষ্ণ।[১] অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্মের প্রবর্তক মহাভারতখ্যাত বাসুদেব কৃষ্ণ অভিন্ন ব্যক্তি।[২] ভাগবত সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে ভগবদ্গীতা। স্মরণীয় বিষয় এই যে, পুরুষযজ্ঞের ব্যাখ্যাতা ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশ এবং কৃষ্ণোক্ত গীতার উপদেশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। উপনিষদের পুরুষযজ্ঞের আদর্শটিই গীতার "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ" ইত্যাদি বিখ্যাত শ্লোকটিতে (৯।২৭) অতি সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। পুরুষযজ্ঞের দক্ষিণারূপ চারিত্রনীতিগুলিও গীতায় যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছে।

---

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩।১৭।৬।

২ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী-কৃত Political History of Ancient India চতুর্থ সং পৃ ১১৯ পাদটীকা ৩।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্
অহিংসা সত্যম্। —১৬।১-২

উপনিষদে যে বেদ- ও যজ্ঞ-বিরোধী ভাব ও অহিংসার আদর্শ সূচিতমাত্র হয়েছে, গীতায় কিন্তু তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।···
যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ২।৪৫-৪৬

এই উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে গীতায় বেদকে পরমার্থলাভের পক্ষে চরম সহায় বলে স্বীকার করা হয়নি, বরং তাকে স্পষ্টতই একটু নীচু স্তরে স্থাপিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ২।৪২

ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে যাঁরা বেদকেই একান্তরূপে মানেন এবং বেদাতিরিক্ত অন্য কিছুই স্বীকার করেন না তাঁদের অতি কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে, এমন কি 'অবিপশ্চিৎ' বা অল্পবুদ্ধি বলে অভিহিত করা হয়েছে। শুধু ঐকান্তিক বেদমার্গীদের অপ্রশংসা করেই গীতাকার ক্ষান্ত হননি, বেদোক্ত দ্রব্যযজ্ঞকেও নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ॥ ৪। ৩৩

এই জ্ঞানযজ্ঞ পূর্বোক্ত জীবনযজ্ঞেরই প্রকারবিশেষ। অহিংসার আদর্শটিও গীতাতে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছে। গীতায় অনেক স্থলেই যথার্থ ধর্মসাধনার উপায়স্বরূপ কতকগুলি চারিত্রনীতির উল্লেখ করা হয়েছে; ওই নীতিগুলির মধ্যে অহিংসা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গীতায় চার জায়গায় এই অহিংসানীতির উল্লেখ পাই।

১ অহিংসা-সমতা-তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ। ১০।৫

২ অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জবম্। ১৩।৭

৩ অহিংসাসত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। ১৬।২

৪ দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৭।১৪

বেদ ও বৈদিক যজ্ঞবিধির বিরুদ্ধতার সঙ্গে অহিংসানীতির কি সম্পর্ক, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও গীতা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মনীতিতে ওই সম্পর্কটি খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৈদিক যজ্ঞবিধি-অনুসারে যে পশুহত্যা অবশ্যকর্তব্য, তারই বিরুদ্ধতা করার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্ম অহিংসানীতিকে এতখানি প্রাধান্য দিয়েছে। গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের প্রায় দুই হাজার বছর পরেও ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের এই বিশিষ্টতার কথা বিস্মৃত হয়নি। জয়দেবের দশাবতারস্তোত্রে বৌদ্ধধর্মের এই যজ্ঞবিরোধী অহিংসাবাদের কথা অতি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে॥

অহিংসানীতির পরম সমর্থক মৌর্যসম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকের অনুশাসন থেকেও এই কথা সমর্থিত হয়। তাঁর প্রথম পর্বতলিপিতেই তিনি বলেছেন,

ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজুহিতব্ বং

‘এখানে কোনো জীব হত্যা করে হোম বা যজ্ঞ করা কর্তব্য নয়’। ‘এখানে’ শব্দের দ্বারা কোন্ জায়গা বোঝাচ্ছে এ-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু অশোক যে জীবহিংসা করে যাগযজ্ঞ করার বিরোধী ছিলেন এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই।

সুতরাং দেখা গেল প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে যজ্ঞোপলক্ষ্যে পশুহত্যা নিবারণের উদ্দেশ্যেই অহিংসানীতির আবির্ভাব হয়েছিল। সে হিসাবে এটি একটি ধর্মনীতি এবং ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ বলেই স্বীকার্য। এই ধর্মনীতিটি প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তাও বিবেচ্য।

২

প্রথমেই দেখতে পাই অহিংসার আদর্শটি চারিত্রনীতি হিসাবে গীতায় পুনঃপুন উল্লিখিত হলেও ওটিকে কখনও যুদ্ধবিরোধী নীতি বলে স্বীকার করা হয়নি। অর্জুনকে অহিংসার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করা হয়নি, বরং যুদ্ধ করতেই উৎসাহিত করা হয়েছে। স্বয়ং বুদ্ধদেবের উপদেশেও কোথাও যুদ্ধের নিন্দা দেখা যায় না। বরং আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে তিনি সমর্থন করতেন এমন প্রমাণ আছে। এই প্রসঙ্গে অজাতশত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হবার প্রাক্‌কালে বৈশালীর বৃজিসংঘ সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।[১]

এবার দেখা যাক অহিংসানীতির পরম অনুরাগী বৌদ্ধসম্রাট্ অশোক ওই নীতিটিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে কতখানি প্রয়োগ করেছিলেন। এ-কথা আজ সর্বজনবিদিত যে, কলিঙ্গযুদ্ধের পর রাজ্যলিপ্সু অশোকের মনে যে অনুশোচনা ও ধর্মকামতা দেখা দিয়েছিল তার ফলে তাঁর রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি মগধের দিগ্‌বিজয়নীতি বর্জন করে নূতন নীতি প্রবর্তন করলেন। ওই নূতন নীতির নাম হল 'ধর্মবিজয়'। 'শরশক্য' বিজয় অর্থাৎ অস্ত্রবিজয়েরই নাম দিগ্‌বিজয়, আর প্রেম বা প্রীতির

১ H. Kern-কৃত Manual of Indian Buddhism পৃ ৪১।

সাহায্যে যে বিজয় তাকেই অশোক ধর্মবিজয় নামে অভিহিত করেছেন। কলিঙ্গযুদ্ধের পর অশোক যুদ্ধের দ্বারা রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে ধর্মবিজয়ের নীতি অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর অবিজিত প্রতিবেশী রাজ্যের অধিবাসীদের আশ্বাস দিয়ে জানিয়ে দেন যে, তাঁর কাছ থেকে তাদের কোনো ভয় নেই, তিনি তাদের দুঃখের হেতু না হয়ে সুখেরই হেতু হবেন। তিনি নিজে দিগ্‌বিজয়নীতি পরিহার করেই ক্ষান্ত হননি; তাঁর পুত্রপ্রপৌত্রেরাও যেন ভবিষ্যতে নবরাজ্যবিজয়ের আকাঙ্ক্ষা মনে স্থান না দেন, সে ইচ্ছাও তিনি তার গিরিলিপিতে চিরস্থায়ী রূপে অঙ্কিত করে গিয়েছেন। এ-ভাবে অশোকের সাম্রাজ্যে রণভেরী গিয়েছিল শুব্ধ হয়ে এবং তার স্থান অধিকার করেছিল ধর্মঘোষণা।

ভেরীঘোসো অহো ধংমঘোসো।[১]

—৪র্থ পর্বতলিপি

এইরূপে রক্তপাতবিতৃষ্ণা শুধু যে অশোকের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল তা নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও এই অহিংসানীতির দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তৎকালে রাজাদের মধ্যে বিহারযাত্রা করে মৃগয়া প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের রীতি খুবই প্রচলিত ছিল। পশুশিকার স্পষ্টতই অহিংসানীতির বিরোধী; তাই অশোক বিহারযাত্রার স্থলে ধর্মযাত্রা অর্থাৎ তীর্থাদি দর্শন করে ধর্মপ্রচারের রীতি প্রবর্তন করেন। পূর্বে অশোকের রন্ধনশালার জন্যে প্রতিদিবস বহু প্রাণী নিহত করা হত। পরে ওই প্রাণীদের সংখ্যা বহুলপরিমাণে কমিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রত্যহ মাত্র দুটি ময়ূর ও একটি মৃগ নিহত করার ব্যবস্থা হয়, অবশ্য প্রত্যহ

১ কেউ কেউ একথাটির অন্যরকম অর্থ করেছেন। ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া-কৃত Inscriptions of Asoka দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ২৪৯-৫০।

একটি করে মৃগ বধ করার রীতিতে প্রায়ই ব্যতিক্রম ঘটত। কিন্তু কালক্রমে এই তিনটি প্রাণী বধ করাও অশোকের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠল এবং তিনি রাজমহানসে প্রাণিহত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়ে নিরামিষাহারী হলেন। এভাবে অশোক ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণরূপে অহিংসাপথের পথিক হলেন। তখনকার দিনে একাজ যে কত কঠিন ছিল আজকাল তা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা সহজ নয়।

ব্যক্তিগত জীবনে অবিমিশ্ররূপে অহিংসাপন্থী হওয়া সম্ভব হলেও রাজনীতিতে তা কতখানি সম্ভব তা অশোকের ইতিহাস থেকে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি তিনি একেবারেই বিমুখ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুশাসন থেকেই প্রমাণিত হয় যে যুদ্ধের সম্ভাব্যতাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে পারেননি। যে অনুশাসনটিতে তিনি কলিঙ্গযুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা দিয়ে নিজের বেদনা ও অনুশোচনার কথা জ্ঞাপন করে বলেছেন, ওই যুদ্ধে মানুষের যে দুঃখকষ্ট হয়েছিল এখন তিনি তার শতভাগ বা সহস্রভাগ দুঃখকষ্টকেও অত্যন্ত শোচনীয় ও গুরুতর বলে মনে করেন, সেই অনুশাসনটিতেই কিন্তু বলা হয়েছে, 'যদি কেউ আমার অপকার করে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করা চলে ততক্ষণই আমি তাকে ক্ষমা করব'।

যো পি চ অপকরেয় তি ছমিতবিয়মতে
যো দেবনং প্রিয়স য়ং শকো ছমনয়ে।

—১৩শ পর্বতলিপি।

এই কথার ইঙ্গিত হচ্ছে এই—কলিঙ্গবিজয়ের পর অশোক যুদ্ধবিগ্রহ পরিহার করেছেন এবং ওই যুদ্ধের সহস্রাংশ দুঃখকষ্টও তিনি কোনো রাজ্যকে দিতে অনিচ্ছুক বটে, কিন্তু তা বলে কেউ যেন মনে না করেন, তবে তো অশোকের রাজ্যের অপকার করা খুবই সহজ।

ওই অপকারেচ্ছুদের তিনি শাসিয়ে বলেছেন, তাঁরও ধৈর্য এবং ক্ষমার একটি সীমা আছে, ওই সীমা অতিক্রান্ত হলে তিনি অস্ত্রধারণ করে তাদের শাস্তিবিধান করতে কুণ্ঠিত হবেন না। এই উপলক্ষ্যে ওই ত্রয়োদশ গিরিলিপিটিতেই অশোক তাঁর সাম্রাজ্যান্তর্গত অটবীরাজ্যের অধিবাসীদের জানাচ্ছেন যে, কলিঙ্গযুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হলেও তিনি শক্তিহীন নন, তাদের কৃতকার্যের জন্যে তারা যদি লজ্জা প্রকাশ না করে তবে তাদের হনন করা হবে।

অবত্রপেয়ু ন চ হংঞেয়সু।

অন্যত্র যেখানে তিনি তাঁর অবিজিত প্রতিবেশী (অংত) রাজ্যের অধিবাসীদের অনুদ্‌বিগ্ন হবার আশ্বাস দিয়ে জানাচ্ছেন, "আমার কাছ থেকে সুখই লাভ করবে, দুঃখ নয়", সেই অনুশাসনটিতেও তিনি কিন্তু তাঁর যুদ্ধবিমুখতার সীমাটুকু নির্দেশ করে দিয়ে এ-কথা বলতে ভোলেননি যে, যতটুকু পর্যন্ত ক্ষমা করা যায় ততটুকুই ক্ষমা করা হবে,

খমিসতি নে দেবানং পিয়ে অফাকং তি এ চকিয়ে খমিতবে[১],

তার বেশি নয়।

এ-সমস্ত তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, অশোক যুদ্ধবিমুখ ছিলেন বটে, কিন্তু সে শুধু রাজ্যবিস্তারমূলক অর্থাৎ offensive ও aggressive যুদ্ধের বিরুদ্ধে। রাজ্যরক্ষামূলক বা defensive যুদ্ধেরও তিনি বিরোধী ছিলেন এ-কথা মনে করার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। আধুনিক কালের অহিংসানীতির সমর্থকদের মতো অশোক সর্বপ্রকার যুদ্ধেরই বিরোধী ছিলেন না এ-কথাটি স্মরণ রাখা উচিত। কলিঙ্গযুদ্ধের পরে অশোককে আর কখনও সমরসজ্জা করতে হয়েছিল কি না, অথবা রামকৃষ্ণকথিত অহিংস সর্পের মতো ফোঁস করেই তিনি

১ দ্বিতীয় বিশেষলিপি, ধৌলি।

অপকারকদের নিরস্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন কি না, তা স্পষ্টরূপে জানা যায় না।

অশোক অনাবশ্যক যুদ্ধবিগ্রহ এবং রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তা বলে তিনি যে সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগ থেকেই বিরত ছিলেন তা নয়। তিনি যে এক সময়ে বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।[১] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভিক্ষুবেশী অশোকের হৃদয়ে ভিক্ষুধর্ম ও রাজধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ ঘটেনি। ভিক্ষুব্রতী হলেও রাজনীতিপালনে তিনি কিছুমাত্র শৈথিল্য বা দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। তাঁর ধর্মপ্রচারের ফলে সকলেই যে অপকার্য থেকে বিরত হয়ে ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠেছিল তা মনে করা যায় না। ধর্মপ্রচার সত্ত্বেও বহু লোকই নানাপ্রকার অপরাধে লিপ্ত হত এবং অশোককেও তাদের শাস্তি-বিধান করতে হত। কেননা দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন, উভয়ই রাজার কর্তব্য। দুষ্টের দমন বলপ্রয়োগসাপেক্ষ এবং ওই বলপ্রয়োগে অশোক কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁকেও কারাগার রক্ষা করতে এবং অপরাধীদের কারারুদ্ধ করতে হত। তবে বছরে একবার করে তিনি কয়েদিদের কারামুক্তি ('বন্ধনমোক্ষ') দিতেন। আর, যারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হত তাদের প্রাণদণ্ডবিধানেও তিনি ইতস্তত করেননি। তবে তিনি বধদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের তিন দিনের সময় মঞ্জুর করতেন, যেন তারা ওই সময়ের মধ্যে

১ অশোকের লিপিতে উক্ত 'ময়া সংঘে উপয়ীতে' অংশটির অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে খ্রীষ্টির সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক ই-ৎসিং অশোকের একটি বৌদ্ধভিক্ষুবেশী মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী কালের তিব্বতী চিত্রেও অশোকের ভিক্ষুবেশ দেখা যায়।

দান উপবাস প্রভৃতি ধর্মাচরণের দ্বারা নিজেদের পারত্রিক কল্যাণ সাধন করতে পারে ও প্রজাসাধারণের মধ্যে অধিকতর ধর্মপরায়ণতার প্রেরণা রেখে যেতে পারে।

আলোচিত তথ্যগুলি থেকেই মানুষের প্রতি প্রযোজ্য অশোকের অহিংসানীতির সীমা কোথায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। কিন্তু ওই নীতিটি আধুনিক কালের ন্যায় প্রাচীন কালেও মানুষ এবং পশু উভয়ের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। অশোক নিজেকে মানুষ এবং পশু সকল জীবের নিকটই ঋণী মনে করতেন। তাই মানুষ পশু প্রভৃতি সর্বভূতের সেবা ও কল্যাণসাধন করে আনৃণ্য লাভ করাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।

ভূতানং আণংনং গচ্ছেযং।

—৬ষ্ঠ পর্বতলিপি

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে তিনি স্বীয় রাজ্যে তথা চোল পাণ্ড্য প্রভৃতি ভারতীয় প্রত্যন্ত দেশে এবং এন্‌টিয়োকস প্রভৃতি প্রতিবেশী যবন (অর্থাৎ গ্রীক) রাজাদের রাজ্যে মানুষ এবং পশু উভয়েরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

দ্বে চিকীছা কতা মনুসচিকীছা চ পসুচিকীছা চ।

—২য় পর্বতলিপি

শুধু তাই নয়, মানুষ এবং পশুর উপযোগী (মনুসোপগানি চ পসোপগানি চ) ওষুধের গাছগাছড়াও যেখানে যা নেই সেখানে তা আনিয়ে রোপণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তা-ছাড়া তিনি পথে পথে কূপখনন এবং বৃক্ষরোপণও করিয়েছিলেন; উদ্দেশ্য মানুষ এবং পশু উভয়েরই স্বাচ্ছন্দ্যবিধান।

পরিভোগায় পসুমনুসানং।

—২য় পর্বতলিপি

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শুধু মানুষের প্রতি নয়, পশু প্রভৃতি জীবের প্রতি দয়াতেও অশোকের হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। এখন দেখা যাক এই জীবের প্রতি অহিংসানীতি সম্পর্কে অশোক কোন্ জায়গায় সীমারেখা টেনেছিলেন।

আমরা পূর্বেই দেখেছি অশোক নিজে আমিষাহার ত্যাগ করে স্বীয় রন্ধনশালার জন্যে সর্বপ্রকার পশুহত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিহারযাত্রা বা মৃগয়াতেও তিনি পশুবধ থেকে বিরত হয়েছিলেন। এ-ভাবে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণরূপে অহিংসানীতির অনুসরণ করতেন বটে, কিন্তু প্রজাসাধারণকে অহিংসা-নীতিপালনে তিনি কতখানি বাধ্য করেছিলেন সেইটেই জিজ্ঞাস্য।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, এ-বিষয়ে তিনি প্রজাদের শুধু উপদেশ দিয়েই নিরস্ত হয়েছিলেন ; কখনও তাদের বাধ্য করেছিলেন বা শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তিনি শুধু পুনঃপুন ঘোষণা করেছেন যজ্ঞার্থে প্রাণিবধ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জীবহিংসা না করাই ভালো।

সাধু অনারংভো প্রাণানং, অবিহীসা ভূতানং।

—৪র্থ পর্বতলিপি

কিন্তু এই উপদেশ পালিত না হলে কোনো শাস্তিবিধানের উল্লেখ তাঁর অনুশাসনে নেই। যজ্ঞার্থে প্রাণিবধ (প্রাণারম্ভো) এবং মাংসাহার বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে জীবহিংসা (বিহিংসা চ ভূতানং), এই দুএর মধ্যে প্রথমটিই অশোকের মতে অধিকতর অন্যায় বলে গণ্য হত। এ-রকম মনে করার হেতু এই যে, অশোক

যতবার ভূতবিহিংসার কথা বলেছেন তার চেয়ে বেশি বলেছেন প্রাণারম্ভের কথা। তৃতীয় গিরিলিপিতে তিনি শুধু বলেছেন 'প্রাণানং সাধু অনারংভো', কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে 'অবিহিংসা (অশোকের অনুশাসনে 'অহিংসা' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় না) ভূতানং' বলার প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রথম গিরিলিপিতে "ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজুহিতয়্বং" এই উক্তির মধ্যে যজ্ঞার্থে পশুবধের বিরুদ্ধে যে-রকম স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, সাধারণ জীবহিংসার বিরুদ্ধে তেমন স্পষ্টোক্তি কোথাও নেই। তা-ছাড়া যজ্ঞার্থে পশুবলির বিরুদ্ধে এই উক্তির কোনো ব্যতিক্রমের উল্লেখ কোথাও নেই। কিন্তু সাধারণ জীবহিংসাবিষয়ক বিধানটির বহু ব্যতিক্রমের কথা দেখা যায় পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে। ওই লিপিতে দেখা যায় অশোক তাঁর রাজ্যাভিষেকের ষড়্বিংশ বৎসরে কতকগুলি জীবকে অবধ্য বলে ঘোষণা করেন; এই অবধ্য প্রাণীদের তিনি একটি তালিকা দিয়েছেন। যথা—শুক, সালিক, চক্রবাক, হংস, ষাঁড়, গণ্ডার, শ্বেতকপোত, গ্রামকপোত। তার পরেই বলেছেন, "যে-সব চতুষ্পদ জীব মানুষ খায়ও না, (চামড়া প্রভৃতির জন্যে মানুষের কাজেও লাগে না"

সবে চতুপদে যে পটিভোগং নো এতি ন চ খাদিয়তি

সেগুলিও অবধ্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অশোক খাদ্যার্থে বা চর্ম প্রভৃতি লাভার্থে পশুবধ নিষেধ করেননি, যদিও তিনি নিজে খাদ্যের জন্যেও পশুহত্যা থেকে বিরত ছিলেন। ওই লিপিতেই দেখা যায় বছরের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে তিনি মাছ ধরা ও বিক্রি করা এবং কতকগুলি জন্তুকে নির্মুষ্ক করা অনুচিত বলে জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু বছরের অধিকাংশ সময়ে এই নিষেধবিধি প্রযোজ্য ছিল না। সুতরাং

দেখা যাচ্ছে অশোক ব্যক্তিগত জীবনে জীবজন্তুসম্পর্কেও সম্পূর্ণ অহিংসানীতির পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও প্রজাসাধারণের উপর নিজের ধর্মবিশ্বাসকে চাপিয়ে দেওয়া সংগত মনে করেননি।[১] এখানেও তাঁর রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাই। তখনকার দিনে মাছমাংস খাওয়া সমগ্র দেশে সুপ্রচলিত ছিল। এ অবস্থায় সমগ্র দেশকে নিরামিষভোজী করে তোলা সম্ভবও ছিল না এবং সে চেষ্টা করাও যথার্থ রাজনীতির কাজ হত না। অশোকও তাই মাছমাংস খাওয়া এবং খাদ্যার্থে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে জীবহত্যা নিষেধ করেননি। তিনি শুধু যজ্ঞার্থে জীবহত্যা ও নিষ্প্রয়োজন জীবহত্যার বিরুদ্ধেই প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। উপনিষদের যুগে পশুঘাতমূলক যাগ-যজ্ঞের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, অশোকের আমলেই তার পূর্ণ পরিণতি দেখতে পাই।

পূর্বে দেখেছি অশোক অহিংসানীতির সমর্থক হলেও সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধবিরোধী বা নরহত্যাবিরোধী ছিলেন না। রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহ এবং তজ্জাত অকারণ নরহত্যার তিনি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রাজ্যরক্ষামূলক যুদ্ধ এবং অপরাধীদের প্রাণদণ্ড-বিধানের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন। এখন দেখলাম অকারণ জীবহত্যা ও যজ্ঞার্থে পশুবধের বিরুদ্ধে প্রচার করলেও তিনি রাজ্যমধ্যে খাদ্যার্থে বা অন্যবিধ প্রয়োজনে জীবহত্যার

১ অশোকের আদর্শস্থানীয় বুদ্ধদেবও স্বীয় সংঘভুক্ত ভিক্ষুগণের পক্ষেও মাছমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। দেবদত্ত যখন ভিক্ষুগণের পক্ষে আমিষাহার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করেন তখনও তিনি তাতে সম্মতি দেননি। Manual of Indian Buddhism by H. Kern পৃ ৭১ ও পাদটীকা ৫, এবং Hindu Civilization by R. K. Mookerji পৃ ২৪৭ পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য।

আবশ্যকতা অস্বীকার করেননি। অর্থাৎ অশোক নিজে ব্যক্তিগত-ভাবে অহিংসানীতির উপাসক হলেও তিনি তাঁর রাজনীতিকে কখনও ওই অহিংসানীতির কুক্ষিগত করে ফেলেননি। ধর্মনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রগত পার্থক্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

৩

ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস থেকে অহিংসা- ও রাজনীতি-বিষয়ক আরও কয়েকটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। কুষাণসম্রাট্ কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও যুদ্ধবিগ্রহ তথা নরহত্যার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র অরুচি ছিল না। বাংলা দেশের বৌদ্ধ পালসম্রাট্গণের পক্ষেও এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য। সম্রাট্ হর্ষবর্ধনও তাঁর বৌদ্ধধর্ম তথা অহিংসানীতির প্রতি অনুরাগের জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জীবনের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন।

ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব) সম্প্রদায়ও অহিংসাপ্রীতির জন্যে বৌদ্ধ এবং জৈন সমাজের সমশ্রেণী বলে গণ্য হয়েছে। ভাগবত সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ভগবদ্গীতাতেও পুনঃপুন অহিংসানীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তা সত্ত্বেও গীতা যে যুদ্ধবিরোধী নয় একথা সকলেরই জানা। এবার ভাগবতসম্প্রদায়ের ইতিহাসের নজিরে দেখা যাক অহিংসা ও রাজনীতি তথা যুদ্ধবিগ্রহের পারস্পরিক সম্পর্ক কতখানি। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে অশোকের যুগ যেমন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, ভাগবতধর্মের ইতিহাসে গুপ্ত-সম্রাট্গণের যুগ তেমনি সব চেয়ে গৌরবময়। বিক্রমাদিত্যপ্রমুখ

পরমভাগবত গুপ্তসম্রাট্‌গণের আধিপত্য ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মৌর্যযুগের চেয়ে কম গৌরবান্বিত করেনি। কিন্তু ভাগবত বা বৈষ্ণব সম্রাট্‌গণ যুদ্ধবিগ্রহ তথা রাজ্যজয়কেই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজকীর্তি বলে গণ্য করতেন। শুধু তাই নয়, যে অনুষ্ঠান- ও হিংসা-মূলক যাগযজ্ঞকে ভগবদ্গীতায় নিকৃষ্ট ও নিম্ন স্তরে স্থাপন করা হয়েছে, পরমভাগবত গুপ্তনরপতিরা সেই যাগযজ্ঞকেও স্বীয় কীর্তিপ্রতিষ্ঠার প্রধান অঙ্গরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমাঙ্ক এবং কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য এই দুইজন সম্রাট্‌ই অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। অথচ ভাগবতধর্মশাস্ত্র গীতার মতে ওই যজ্ঞ প্রশস্ত নয়, কেননা অশ্বমেধ দ্রব্যময়ও বটে এবং অহিংসানীতির প্রতিকূলও বটে।

এবার কয়েকজন বিখ্যাত জৈন রাজার ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। জৈন নৃপতিদের মধ্যে কলিঙ্গের চেতবংশীয় সম্রাট্ খারবেল (খ্রী পূ দ্বিতীয় বা প্রথম শতক), দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশীয় সম্রাট্ অমোঘবর্ষ (৮১৫-৭৭) এবং গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় অধিপতি কুমারপালের (১১৪৩-৭৪) নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দিগ্‌বিজয়লিপ্সু খারবেলের বিজয়বাহিনী উত্তরে মগধ থেকে দক্ষিণে পাণ্ড্যভূমি পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু স্থানেই কলিঙ্গরাজবংশের পরাক্রম বিস্তার করেছিল। জৈন ধর্মের অহিংসানীতি এই দিগ্‌বিজয়ের বিরোধী বলে গণ্যই হয়নি। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ ছিলেন জৈনধর্মের পরম অনুরাগী এবং সুপ্রসিদ্ধ জৈনকবি জিনসেনাচার্য ছিলেন তাঁর ধর্মগুরু। এই পরম উৎসাহী জৈন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় নবম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে জৈন ধর্মের অতি দ্রুত অভ্যুদয় ঘটেছিল। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে অমোঘবর্ষ তাঁর সমগ্র রাজত্বকালটাই যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়েছিলেন। চৌলুক্যরাজ কুমারপাল জৈনাচার্য

হেমচন্দ্র স্থরীর প্রভাবে জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই নবগৃহীত ধর্মের প্রতি অত্যধিক অনুরাগও তাঁকে রাজ্যলিপ্সা ও সংগ্রাম থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। অথচ অহিংসানীতির প্রতি তাঁর অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, কথিত আছে পশুপক্ষী বা কীট-পতঙ্গের প্রাণনাশের অপরাধে তিনি মানুষের প্রাণদণ্ডবিধানেও দ্বিধাবোধ করতেন না। অহিংসানীতির আতিশয্য ও বিকার ঘটলে তা যে কতখানি স্ববিরোধী ও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, কুমারপালের এই আচরণ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমরা দেখেছি বৌদ্ধধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও সম্রাট্ হর্ষবর্ধন রাজ্যজয় ও যুদ্ধবিগ্রহে কখনও বিরত হননি। তাঁরও অহিংসাপ্রীতির আতিশয্যের প্রমাণ পাই হিউএন্থসাঙএর গ্রন্থে। উক্ত চৈনিক লেখকের মতে হর্ষবর্ধন স্বীয় রাজ্যে সর্বপ্রকার জীবহত্যা ও আমিষভোজন নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং এই নিষেধাজ্ঞা অপালনের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। চৈনিক পণ্ডিতের এই উক্তিটি কতখানি সত্য তা বলা যায় না; আর সত্য হলেও আপাতদৃষ্টিতে এটিকে যত গুরুতব মনে হয় বস্তুত তা ছিল না। কেননা হর্ষবর্ধনেব পূর্ববর্তী গুপ্তযুগেই দেখা যায় অহিংসানীতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে একটি সর্বজনগ্রাহ্য নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৮০-৪১৩) রাজ্য সম্বন্ধে চৈনিক ভিক্ষু ফা হিয়ান লিখেছেন, Throughout the country no one kills any living thing...they do not keep pigs or fowls, there are no dealings in cattle, no butchers' shops or distilleries in their market-places. এর থেকে বোঝা যায় দিগ্‌বিজয়নীতির অনুসরণের ফলে গুপ্তযুগে যুদ্ধবিগ্রহ এবং অশ্বমেধ যথেষ্ট লোকপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও

জনসাধারণ দৈনন্দিন জীবনে অহিংসাপন্থী ও নিরামিষভোজী হয়ে উঠেছিল। আজও ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য। এটি যে অশোকের প্রচারিত 'অবধ্য'নীতির একটি বিস্ময়কর ফল এ-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। যাহোক হর্ষবর্ধনের আমলে সমাজের সাধারণ অবস্থা যে গুপ্তযুগ থেকে ভিন্নরূপ ছিল এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। যদি তাই হয় তবে হিউএন্থ্সাঙ্এর পূর্বোদ্ধৃত উক্তির গুরুত্ব যে অনেক কমে যায় সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তথাপি চৈনিক পরিব্রাজকের উক্তি সত্য হলে বলতে হবে হর্ষবর্ধনের অহিংসানীতি বিকারগ্রস্ত হয়ে বাড়াবাড়ির দিকে ঝুঁকেছিল।

আশা করি এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হবে যে, ভারতবর্ষীয় অহিংসানীতি আসলে ছিল ধর্মসংস্কারমূলক, মুখ্যত যজ্ঞার্থে পশুবলিবিরোধী। পরে ওই নীতি আহারার্থে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে পশুহত্যার বিরুদ্ধতার রূপও ধারণ করে। কিন্তু ওই নীতি কখনও যুদ্ধ বা মৃত্যুদণ্ডবিধানের বিরোধী বলে স্বীকৃত হয়নি।

ধর্মনীতি

১

এ-কথা বলা বাহুল্য যে আধুনিক ভারতবর্ষের সব চেয়ে কঠিন সমস্যা হচ্ছে ধর্মসম্প্রদায়গত। এই সমস্যার শৈলশিখরে আহত হয়ে অখণ্ড ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনতরী শতধা খণ্ডিত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই বিষম সমস্যার সমাধান করতে হলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের ধর্মবিষয়ক অবস্থার ঐতিহাসিক আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকের অবলম্বিত ধর্মনীতির আদর্শ এ-বিষয়ে আমাদের কতখানি সাহায্য করতে পারে এখন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

শুধু ভারতবর্ষের নয়, পরন্তু সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নরপতি হচ্ছেন অশোক, এ-কথা আজ সর্ববাদিস্বীকৃত। প্রাগাধুনিক যুগে গৌতম বুদ্ধ বাদে একমাত্র অশোকই ভারতবর্ষকে পৃথিবীর কাছে পরিচিত করেছেন এবং গৌতম বুদ্ধকেও অশোকই বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন এ-কথা বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। বৌদ্ধদের বিশ্বাস বৌদ্ধধর্মের মহত্ত্বই অশোককে শ্রেষ্ঠতা দান করেছে। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এ বিশ্বাসের অনুকূল নয়। বরং অশোকই স্বীয় মহত্ত্বের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। যে মহাপ্রাণতার প্রেরণায় দিগ্‌বিজয়লিপ্সু অশোক কলিঙ্গযুদ্ধে জয়লাভের পর চিরকালের জন্য অস্ত্রত্যাগ করলেন সে মহাপ্রাণতা তিনি বৌদ্ধধর্মের কাছে পাননি। কেননা সে ঘটনা হচ্ছে তাঁর বৌদ্ধধর্মগ্রহণের পূর্ববর্তী। বরং এ-কথাই সত্য যে ওই মহানুভবতার আবেগে অশোক যেদিন বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করলেন সেদিন থেকেই

উক্ত ধর্ম নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। অশোকের পূর্বে ও-ধর্ম ক্রমবিস্তারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সুতরাং এই হিসাবে অশোককে যদি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যায় তাহলে বোধকরি কিছুমাত্র অন্যায় হয় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে উপলক্ষ্য করে ভারতবর্ষের গৌরবকে জগতের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এইটেই যে অশোকের শ্রেষ্ঠতাস্বীকৃতির একমাত্র কারণ, তা নয়। বস্তুত অশোকের মহত্ত্ব ছিল বহুমুখী এবং তাঁর প্রতিভার এই বহুমুখীনতাও আজ একবাক্যে স্বীকৃত। এ-সব কারণে আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমহলে অশোক সম্বন্ধে যত বিস্তৃত ও বিচিত্র রকম আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্বন্ধে তা হয়নি। কিন্তু তথাপি অশোকের চরিত্র তথা রাজনীতি সম্বন্ধে গবেষণার বহু অবকাশ এখনও রয়েছে। এই আশ্চর্য মানুষটির চরিত্র, নীতি ও কার্যকলাপের মর্মার্থ এখনও সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয়নি এ-কথা মনে করার হেতু আছে। আমার মনে হয় তাঁর অবলম্বিত ধর্মনীতি (religious policy) সম্বন্ধে এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে অশোকের ইতিহাস সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যসাহিত্য যেমন নীরব বৌদ্ধসাহিত্য তেমনি মুখর। এক পক্ষের অতিনীরবতা এবং অপর পক্ষের অতিমুখরতা, কোনটাই নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধানের সহায়ক নয়। সৌভাগ্যবশত অশোক নিজেই আমাদের জন্য অনেকগুলি শিলালিপি রেখে গিয়েছেন। এই লিপিগুলির অভিপ্রায় ও মর্যাদা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছ রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভাষায়। "জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ

সম্রাট্ অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন।···অশোকের সেই মহাবাণী কত শত বৎসর মানব-হৃদয়কে বোবার মত কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে।···সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্র দ্বীপের কথা অশোক কখনও কল্পনাই করেন নাই, বহু সহস্র বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী[১] আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন।"[২] যেদিন উক্ত বিদেশী এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করলেন সেদিনই ভারতবর্ষের চরম গৌরবের অধ্যায় জগতের আছে প্রথম উদ্‌ঘাটিত হল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাটের কীর্তিকাহিনী বর্তমান কালের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। বস্তুত এই শিলালিপিগুলিকে এক হিসাবে অশোকের আত্মজীবনী বলে মনে করা যেতে পারে এবং অশোকের আধুনিক জীবনীকারদেরও প্রধান অবলম্বন হচ্ছে ওই লিপিগুলি। এগুলি থেকে অশোকের ধর্মনীতির আদর্শ সম্বন্ধে কি জানা যায়, তাই হচ্ছে এস্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

২

আমরা ইস্কুলপাঠ্য ইতিহাস পড়েই শিখে থাকি (এবং কলেজেও এ-শিক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটে) যে, অশোক ছিলেন নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম প্রচারই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র বা মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বদেশে এবং

১ এই বিদেশী হচ্ছেন বিখ্যাত মনস্বী জেমস প্রিনসেপ (১৭৯৯-১৮৪০)। ১৮৩৭ সালে তিনি অশোকের শিলালিপির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন।

২ "সাহিত্য" গ্রন্থে "সাহিত্যের সামগ্রী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বিদেশে উক্ত ধর্মের প্রচারকার্যেই তিনি তাঁর সমস্ত রাজশক্তি ও রাজকোষকে নিযুক্ত করেছিলেন ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবার আদর্শ রাজা বলেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই দুটি উক্তি যে পরস্পরবিরোধী এ-কথা একবারও আমাদের মনে হয় না। আদর্শ রাজার কর্তব্য হল সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি সমব্যবহার করা। কেননা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপক্ষপাত ন্যায়পরতার অত্যাজ্য অঙ্গ। আর, কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা পক্ষপাতিত্বেরই নামান্তর। অশোক যদি বৌদ্ধধর্মকে রাজকীয় ধর্মে অর্থাৎ রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করতে চেষ্টিত হয়ে থাকেন তাহলে বলতে হবে তিনি ভারতীয় ন্যায়পরায়ণ রাজার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। ইউরোপের ইতিহাসে ক্যাথলিকপ্রোটেস্ট্যাণ্ট দ্বন্দ্বের যুগে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন বলেই এত অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে বহু রক্তপাত এবং দুঃখকষ্টের পর রাষ্ট্র যখন সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি অপক্ষপাতে সমভাব অবলম্বন করল তখনই ইউরোপে ধর্মদ্বন্দ্বের অবসান হল। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রুসেড বা জেহাদ অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের একান্ত অভাব। গাজী, শহীদ বা martyrএর আদর্শদ্বারা ভারতবর্ষ কখনও অনুপ্রাণিত হয়নি। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমব্যবহারই ছিল ভারতীয় রাজার আদর্শ। সমুদ্রগুপ্ত-চন্দ্রগুপ্ত-প্রমুখ গুপ্তসম্রাট্‌গণ ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব) ধর্মাবলম্বী ; কিন্তু তাঁদের আমলে উক্ত ধর্ম কখনও রাজকীয় ধর্ম বা রাষ্ট্রধর্ম (state religion) রূপে গণ্য হয়ে বিশেষ প্রাধান্য বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। ফলে শৈব, সৌর, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়গুলি রাজকীয় রক্ষণাবেক্ষণ তথা বদান্যতা থেকে বঞ্চিত

হয়নি। হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভকরবর্ধন ছিলেন সৌর, তাঁর ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন ও ভগিনী রাজ্যশ্রী ছিলেন বৌদ্ধ, আর হর্ষবর্ধন নিজে ছিলেন শৈব অথচ বুদ্ধ- এবং সূর্য-উপাসনাও করতেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধ পালরাজারা নারায়ণ, শিব প্রভৃতি দেবোপাসনার এবং এমন কি বৈদিক যাগযজ্ঞের পৃষ্ঠপোষকতা করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধসাহিত্যে অশোকের পরেই যাঁর নাম সেই কুষাণ-সম্রাট্ কনিষ্কের মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনিও বুদ্ধ, শিব, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি বহু দেশী এবং বিদেশী দেবতাগণের প্রতি অপক্ষপাতে সমান সম্মান দেখাতেন। এ ক্ষেত্রে একমাত্র অশোকই ভারতবর্ষীয় রাজাদের অপক্ষপাতের চিরন্তন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি একান্তভাবে ঝুঁকে পড়লেন এবং উক্ত ধর্মের প্রচার ও প্রসারকেই জীবনের ব্রত করে তুললেন, এ-কথা বিশ্বাস করতে স্বভাবতই অনিচ্ছা হয়। অতএব অশোকের বৌদ্ধধর্মপ্রচারের কাহিনীতে কতখানি সত্য আছে বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

৩

অশোক যদি সত্যসত্যই বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করাকেই তাঁর রাজকীয় কর্তব্যের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়ে থাকেন তাহলে বহুনিন্দিত মোগলসম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ থাকে কোথায়? ইসলাম-ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগবশত ঔরঙ্গজীব সম্প্রদায়নির্বিশেষে সমস্ত প্রজার প্রতি সমদৃষ্টির আদর্শকে উপেক্ষা করেছিলেন, প্রধানত এইজন্যই তো তিনি ঐতিহাসিকদের কাছে নিন্দাভাজন হয়েছেন।

ঔরঙ্গজীব ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামরাজ্য ("দারু-ল্-ইসলাম") বলেই গণ্য করতেন এবং সে-রাজ্যে অন্য ধর্মের কোনো স্থান আছে বলে তিনি মনে করতেন না। সেইজন্যেই তিনি 'অবিশ্বাসী'দের উপর নানাপ্রকার নিষেধবিধি আরোপ করতে কুণ্ঠিত হননি। এ-সব কারণে মুসলমান হিসাবে ঔরঙ্গজীবের স্থান যত উচ্চেই হোক না কেন রাজা হিসাবে তাঁর ব্যর্থতা ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন। আমাদের ইস্কুল- ও কলেজ-পাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থ পড়লে মনে হয় অশোকও ঔরঙ্গজীবের মতো ধর্মপ্রচারকেই জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সত্যই যদি বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার (অর্থাৎ স্বদেশ ও বিদেশের জনগণকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করাই) অশোকের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হয় তাহলে রাজা হিসাবে তাঁর ব্যর্থতা অবশ্যস্বীকার্য। এ-কথা বলা যেতে পারে যে, অশোক জনগণকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করতেন বটে কিন্তু এজন্য তিনি ঔরঙ্গজীবের মতো অন্য সম্প্রদায়ের উপর পীড়ন করতেন না। এ-কথা যদি সত্য হয় তাহলেও ভারতীয় আদর্শের বিচারে অশোককে একজন বিচক্ষণ ও মহান্ রাজা বলে মেনে নেওয়া যায় না।

আসল কথা এই যে, প্রাচীন বৌদ্ধ প্রচারসাহিত্যে এবং আধুনিক ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসপুস্তকে যাই থাকুক না কেন অশোক স্বদেশে বা বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন কিংবা জনগণকে উক্ত ধর্ম গ্রহণ করতে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করেছিলেন এ-কথা মনে করার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। অশোকের ইতিহাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান হচ্ছে তাঁর শিলালিপিগুলি। এগুলির সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। আজ পর্যন্ত অন্তত পঁয়ত্রিশটি লিপি

আবিষ্কৃত হয়েছে।' কিন্তু এতগুলি লিপির কোথাও বৌদ্ধধর্মের গৌরব কীর্তিত হয়নি। এজন্যেই ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেছেন, "Though himself convinced of the truth of Buddha's teaching...Asoka probably never sought to impose his purely sectarian belief on others." ।[১] তিনি তাঁর প্রজাগণকে ধর্মাচরণে উৎসাহিত করতেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও তাদের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হতে কিংবা 'নির্বাণ' প্রাপ্তির পথ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেননি।

৪

মৌর্যরাজাদের আমলে ভারতবর্ষে অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিদ্যমান ছিল। তার মধ্যে অশোকের লিপিতেই চারটির উল্লেখ আছে। যথা, দেবোপাসনা- ও যাগযজ্ঞ-পরায়ণ বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, মংখলিপুত্ত গোসাল-প্রবর্তিত আজীবিক ধর্ম, মহাবীর বর্ধমান-প্রবর্তিত নিগ্রন্থ বা জৈন ধর্ম এবং গৌতম বুদ্ধ-প্রবর্তিত সদ্ধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম। তাছাড়া দেবকীপুত্র বাসুদেব কৃষ্ণ-প্রবর্তিত ভাগবত ধর্মের কথা অশোক-লিপিতে না থাকলেও এটি যে তৎকালে প্রচলিত ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেননা খ্রীষ্টপূর্ব ৩০২ অব্দের পরে লিখিত মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থেই যমুনাতীরবর্তী মথুরা প্রভৃতি স্থানে উক্তধর্মাবলম্বীদের কথা পাওয়া যায়। এই ধর্মের সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান গ্রন্থ

---

[১] *Political History of Ancient India* ৪র্থ সং পৃ ২৮০।

'ভগবদ্‌গীতা'ও অশোকের রাজত্বের (খ্রী পূ ২৭৩-৩২) কাছাকাছি সময়েই রচিত হয়েছিল বলে অনুমতি হয়।[১]

যাহোক আজীবিক, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিনটি অবৈদিক ও ও অব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বভাবতই বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী ছিল। কিন্তু এদের নিজেদের মধ্যেও যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছুমাত্র অভাব ছিল না তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে তৎকালীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে। ক্ষত্রিয়প্রবর্তিত ভাগবত ধর্মও যে মূলত বেদ- ও ব্রাহ্মণ-বিরোধী ছিল এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই। পরবর্তীকালে বৈদিক ব্রাহ্মাণ্য ধর্মের সঙ্গে আপস হয়ে গেলেও অন্য ধর্মগুলির সঙ্গে এর যথেষ্ট বিরোধ ছিল বলেই মনে হয়। অন্তত বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ভাগবত ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলে ঐতিহাসিকগণও অনুমান করেন। যেমন, ডক্টর রায়চৌধুরীর মতে "The earlier Brahmanical attitude towards the faith (Bhagavatism) was one of hostility, but later on there was a combination between Brahmanism and Bhagavatism probably owing to the Buddhist propaganda of the Mauryas"।[২] বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও এ-সময়ে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি নানা মার্গ এবং সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি নানা মতবাদ দেখা দিয়েছিল। আর গীতার সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস থেকেও বোঝা যায় বৈদিক ধর্মমতগুলির মধ্যেও যথেষ্ট সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল না। এ সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও মতবাদগুলির পারস্পরিক বিরোধ ও বিবাদের প্রমাণ যে শুধু তৎকালীন

---

১ ডক্টর রায়চৌধুরী-প্রণীত *Early History of the Vaishnava Sect* ২য় সং পৃ ৮৭।

২ উক্ত গ্রন্থ পৃ ৫-৬।

সাহিত্যেই পাওয়া যায় তা নয়, অশোকের শিলালিপিতেও তার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে।

বস্তুত যে-সময়ে ভারতবর্ষ এই সমস্ত পরস্পরবিবদমান ধর্ম ও মতবাদের কলহে মুখরিত হয়ে উঠেছিল ঠিক সে সময়েই ধর্মপ্রাণ অশোকের আবির্ভাব। তিনি এই কলহপরায়ণ ধর্মমত ও সম্প্রদায়গুলির প্রতি কি মনোভাব অবলম্বন করলেন তা জানতে স্বভাবতই খুব ঔৎসুক্য হয়। সৌভাগ্যবশত অশোক তাঁর দ্বাদশসংখ্যক পর্বতলিপিতে এ-বিষয়ে তাঁর অবলম্বিত নীতির অতি সুস্পষ্ট পরিচয় রেখে গিয়েছেন। এ স্থলে সমগ্রভাবেই ওই লিপিটির মর্মানুবাদ দেওয়া গেল।

"দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) সকল সম্প্রদায়-('পাষণ্ড'-) ভুক্ত পরিব্রাজক ও গৃহস্থ সকলকেই দান এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে সম্মান ('পূজা') করে থাকেন। কিন্তু দেবতাদের প্রিয় (রাজা অশোকের) মতে সকল সম্প্রদায়ের 'সারবৃদ্ধি'-সাধনের মতো দান বা সম্মান আর কিছুই নেই। সারবৃদ্ধিও বহুবিধ। কিন্তু তার মূল হচ্ছে বাক্‌সংযম ('বচগুপ্তি')। আর, বাক্‌সংযম মানে হচ্ছে অকারণেই আপন সম্প্রদায়ের প্রশংসা ('আত্মপাষণ্ডপূজা') ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা ('পরপাষণ্ডগর্হা') না করা। বিশেষ কারণে যদি তা করতেই হয় তাহলেও লঘু (বা মৃদু) ভাবেই করা উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের প্রশংসা (অর্থাৎ গুণস্বীকার) করাও কর্তব্য। এ-রকম করলে স্বসম্প্রদায়ের উন্নতি ('বৃদ্ধি') হয় এবং পরসম্প্রদায়েরও উপকার হয়। অন্যথা স্বসম্প্রদায়েরও ক্ষতি হয়, পরসম্প্রদায়েরও অপকার হয়। যে কেউ (শুধু) আত্ম-সম্প্রদায়প্রীতি-('ভক্তি'-) বশত, অর্থাৎ তার গৌরববৃদ্ধির উদ্দেশ্যে,

স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রশংসা ও অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করেন তিনি তদ্দ্বারা স্বীয় সম্প্রদায়ের ক্ষতিই করেন।

"অতএব (সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের) একত্র সমবেত হওয়াই ভালো ('সমবায়ো এব সাধু')। তাতে সকলেই পরস্পরের ধর্ম (-তত্ত্ব) শুনতে পারে এবং শুনতে ইচ্ছুক হয়। দেবতাদের প্রিয় (রাজা অশোকর) ইচ্ছাও এই যে, সর্বসম্প্রদায়ই বহুশ্রুত (অর্থাৎ সকল ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন) এবং কল্যাণগামী হোক।

"সুতরাং যাঁরা যে ধর্মের প্রতিই অনুরক্ত থাকুন না কেন, তাঁদের সকলের কাছেই এ-কথা বক্তব্য যে, দেবতাদের প্রিয় (রাজা অশোকের) মতে কোনো দান বা সম্মানই সর্বসম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধির মতো নয়। এতদর্থেই (অর্থাৎ উক্তপ্রকার সারবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই) ধর্মমহামাত্র, স্ত্র্যধ্যক্ষমহামাত্র, বচভূমিক ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ ব্যাপৃত আছেন। এর ফল হচ্ছে সকল সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি ও ধর্মের বিকাশ ('ধংমস দীপনা')।"

এই লিপিটি থেকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হচ্ছে যে অশোকের সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত উৎসাহী ব্যক্তিরা নিছক স্বধর্মপ্রীতিবশত স্বসম্প্রদায়ের গুণকীর্তন ও অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করতে কুণ্ঠিত হতেন না এবং এ-কার্যে অনেক সময়েই বাক্‌সংযমের অভাবও লক্ষিত হত। এই ধর্মকলহের যুগে অশোক যদি রাজাসন থেকে বৌদ্ধধর্মের মহিমাকীর্তনে ব্রতী হতেন তাহলে উক্ত ধর্মকলহ প্রবলতর হয়ে ভারতবর্ষের অবস্থাকে শোচনীয় করে তুলত।

কিন্তু ওই লিপিটিতেই দেখা যাচ্ছে অশোক সকলকেই স্বধর্ম-প্রশংসায় ও পরধর্মসমালোচনায় বিরত হতে কিংবা বাক্‌সংযম অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি পরধর্মের

গুণস্বীকার করতে এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেও উপদেশ দিয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচার করা সম্ভবপর ছিল না। কেননা ধর্মপ্রচার করার মানেই হচ্ছে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় কোনো বিশেষ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করা এবং তাতে আত্মপাষণ্ডপূজা ও পরপাষণ্ডগর্হা তথা বাক্‌সংযমের সীমালঙ্ঘনও অনিবার্য। বস্তুত উক্ত লিপিটির গোড়াতেই অশোক জানাচ্ছেন যে তিনি দানাদি কার্যদ্বারা সকল সম্প্রদায়ভুক্ত পরিব্রাজক ও গৃহস্থ সকলের প্রতিই সমভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। অন্যান্য লিপিতেও তিনি পুনঃপুন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণকে সমভাবে সম্মান ও দান করার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ-সমস্ত উক্তি যে নেহাত মুখের কথা মাত্র নয়, ঐতিহাসিকগণ তা স্বীকার করেছেন। গয়ার নিকটে 'বরাবর' পর্বতে তিনি আজীবিক সন্ন্যাসীদের জন্যে যে তিনটি চমৎকার গুহা তৈরি করে দিয়েছিলেন, তাতেই তাঁর উক্তির আন্তরিকতা ও হৃদয়ের উদারতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং অশোকের বৌদ্ধধর্মপ্রচারের কাহিনীকে নিতান্ত অমূলক বলেই স্বীকার করতে হয়।

৫

আমরা দেখেছি পূর্বোক্ত দ্বাদশসংখ্যক পর্বতলিপিটিতে অশোক একাধিকবার সর্বধর্মের সারবৃদ্ধির উপর খুব জোর দিয়েছেন এবং সর্বশেষে বলেছেন যে, তাতেই 'ধর্মে'র বিকাশ ('ধংমস দীপনা') হয়। তাছাড়া উক্ত পর্বতলিপিটিতে যাকে বলেছেন 'সারবৃদ্ধি',

পঞ্চম পর্বতলিপিতে তাকে তিনি 'ধর্মবৃদ্ধি' বলে অভিহিত করেছেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, সর্বধর্মের অন্তর্নিহিত যে সাধারণ সারবস্তু তাকেই তিনি বলতেন 'ধর্ম' এবং যে-ধর্মের প্রচার তিনি করেছিলেন সে হচ্ছে ওই সর্বধর্মসার। এক স্থানে (২য় ক্ষুদ্র পর্বতলিপি) তিনি এই সারধর্মকে 'পোরাণা পকিতী' অর্থাৎ চিরাগত প্রাচীন নীতি বলে বর্ণনা করেছেন। ভিনসেণ্ট স্মিথও স্বীকার করেছেন যে, "The morality inculcated (by Asoka) was, on the whole, common to all the Indian religions"। ডক্টর রায়চৌধুরীও অশোকপ্রচারিত ধর্মকে "the common heritage of Indians of all denominations" বলেই বর্ণনা করেছেন। যাহোক এই যে চিরাগত নীতিরূপ সারধর্ম, অশোকের লিপিগুলিতে বহুস্থলেই তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তার থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অশোকপ্রশংসিত এই সারধর্ম আসলে কতকগুলি চিরন্তন ও সর্বজনীন চারিত্রনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তিনি আত্মা, ঈশ্বর (বা ব্রহ্ম), পুনর্জন্ম, নির্বাণ (বা মোক্ষ), জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি বা অন্য কোনো দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদের কথা বলেননি। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর প্রজাগণকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও দাসভৃত্যাদির প্রতি সদ্ব্যবহার, প্রাণীর প্রতি অবিহিংসা, পরধর্মসহিষ্ণুতা, সংযম, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা, দান, দয়া, অনালস্য, সত্যবচন ইত্যাদি চারিত্রনীতি অনুসরণ করতে পুনঃপুন উপদেশ দিয়েছেন এবং এগুলিকেই তিনি 'ধর্ম' নামে অভিহিত করেছেন। এইজন্যই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "The aspect of *dharma*, which he emphasised, was a code of morality rather than a system of religion"।

সুতরাং এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না যে অশোক কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম প্রচার করেননি। কিন্তু তথাপি তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত হয়ে কোশলমগধের ক্ষুদ্র গণ্ডি লঙ্ঘন করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে উদ্যত হয়ে উঠেছিল এ-কথা অনুমান করার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি নেই। ব্যক্তিগতভাবে অশোক পরমনিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন এবং খুব সম্ভবত তিনি ভিক্ষুবেশও ধারণ করেছিলেন।[১] সুতরাং জনসাধারণ যদি অশোকের প্রচারিত অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েও তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শ ও আচরণের দ্বারাই বেশি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে তাতে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই, বরং উক্তপ্রকার রাজকীয় আদর্শের প্রভাব এড়িয়ে চলাই কঠিন। তাছাড়া স্বয়ং রাজা ও ধর্মমহামাত্রাদি রাজপুরুষগণের উদ্‌যোগে আহূত 'সমবায়' বা ধর্মসম্মেলনগুলিতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের এবং তৎসংস্পর্শে আসার বহু সুযোগও জনসাধারণ নিশ্চয় পেয়েছিল। হিউএন্‌ৎসাঙকে অভ্যর্থনা করা উপলক্ষ্যে হর্ষবর্ধনকর্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্মসমবায়ের কথা স্মরণ করলেই এ-কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। এ-রকম সমবায় অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে বৌদ্ধধর্মের পক্ষে ওভাবে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হবার সুযোগ ছিল না। সুতরাং অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের পথ অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল এ-কথা মনে করা অসংগত নয়।

যা হোক উক্তপ্রকার ধর্মসমবায় উপলক্ষ্যে জনসাধারণকে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দিলেও অশোক বৌদ্ধধর্মের গৌরব তথা প্রসার বর্ধনার্থ ও-ধর্মের অযথা প্রশংসা ও অন্য ধর্মের নিন্দার

১ পৃ ৩১—পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্রয় দেননি। তার কারণ এই যে, তিনি যে রাজা এবং রাজা হিসাবে কোনো বিশেষ ধর্মের (ব্যক্তিগত ভাবে সে-ধর্ম তাঁর যত প্রিয়ই হোক না কেন) পৃষ্ঠপোষকতা করা তাঁর পক্ষে অনুচিত (অর্থাৎ রাজধর্মবিরোধী) এ-কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। 'দেবানং প্রিয়ো পিয়দসি রাজা এবম্ আহ', তাঁর লিপিগুলির এই সাধারণ মুখবন্ধ এবং 'সবে মুনিসে পজা মমা' (সব প্রজারাই আমার পুত্রস্থানীয়) এই বিখ্যাত উক্তিটি থেকেও বোঝা যায়, তিনি তাঁর 'রাজ'পদ তথা 'রাজ'কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন ছিলেন। কোনো শক্তিশালী রাজার পক্ষে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ধর্মমতকে প্রজাদের দ্বারা ব্যাপকভাবে স্বীকার করিয়ে নেওয়া কম প্রলোভনের বিষয় নয়। অশোক সেই প্রলোভনকে সংযত করেছিলেন বলেই মনে হয় এবং এটাই তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের বিষয়। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত ধর্মমতকে অন্তরালে রেখে এবং তৎকালপ্রচলিত বহু মতবাদের কোনোটিরই দিকে কিছুমাত্র না ঝুঁকে তিনি যে সর্বধর্মের সাধারণ সারবস্তুরূপ চারিত্রিক নীতির উন্নতিসাধনেই ব্রতী হয়েছিলেন এবং 'সমবায়'-নীতি আশ্রয় করে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, এখানেই অশোকের যথার্থ শ্রেষ্ঠতা এবং আদর্শরাজোচিত বিচক্ষণতার পরিচয় পাই।

৬

এ-স্থলে অশোকের ধর্মনীতির সঙ্গে ঔরঙ্গজীব ও আকবর, ভারতবর্ষের এই দুইজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতির অবলম্বিত নীতির তুলনামূলক আলোচনা করা অসংগত হবে না। তাতে আমাদের

আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্টতর হবে বলেই মনে করি। প্রসঙ্গক্রমে এঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করা যাবে। আশা করি তাতে ঔৎসুক্যহানি ঘটবে না।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, প্রাগাধুনিক যুগে প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী মহাসাম্রাজ্যের প্রথম অধীশ্বর হচ্ছেন অশোক এবং শেষ অধীশ্বর হচ্ছেন ঔরঙ্গজীব। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের এই দুইজন মহাসম্রাটের ব্যক্তিগত চরিত্রে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। সিংহাসনলাভের জন্য দুজনকেই গৃহযুদ্ধে ও ভ্রাতৃনিধনে লিপ্ত হতে হয়েছিল এবং উভয়েরই রাজ্যাভিষেক হয় সিংহাসনপ্রাপ্তির কিছুকাল পরে। উভয়েরই চরিত্রগত প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বধর্মানুরাগ। উভয়েই নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্রে গভীরভাবে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ঐকান্তিক ধর্মপ্রাণতা এবং সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার জন্যে উভয়েই সমকালীন জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। ঔরঙ্গজীবকে তৎকালীন মুসলমানসম্প্রদায় 'জিন্দাপীর' এবং রাজবেশধারী 'দরবেশ' বলে সম্মান করত। অশোক সত্যসত্যই বৌদ্ধসংঘে যোগ দিয়ে ভিক্ষুবেশ ধারণ করেছিলেন এ-কথা মনে করার হেতু আছে। সুতরাং একজন ছিলেন রাজবেশী দরবেশ, আরেকজন ছিলেন ভিক্ষুবেশী রাজা। অনালস্য ছিল এদের চরিত্রের আরেক বৈশিষ্ট্য, স্বীয় কর্তব্যপালনে এবং রাজকার্য পরিদর্শনে এঁদের কেউ যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু তাঁদের চরিত্রগত বৈষম্যও কম গুরুতর নয়। ঔরঙ্গজীব স্বীয় রাজ্যে ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অশোক স্বীয় শাসনকালের ইতিহাস না হোক ঐতিহাসিক উপাদানসমূহকে রাজ্যের সর্বত্র পর্বতগাত্রে ও শিলাস্তম্ভে চিরস্থায়ীরূপে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

একজন ছিলেন সর্বপ্রকার শিল্পসৃষ্টির প্রতি সম্পূর্ণ বীতরাগ, আরেকজন ভারতবর্ষের শিল্পইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগের প্রবর্তক।[১] একজন স্বীয় ধর্মের মহিমাপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সারাজীবন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকে আকবরের বুদ্ধি ও বীর্যবলে সুপ্রতিষ্ঠিত মোগলসাম্রাজ্যের ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়ে দিলেন, আরেকজন ঐকান্তিক ধর্মানুরক্তিবশত সর্বপ্রকার হিংসা তথা যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চন্দ্রগুপ্তের স্ববীর্যার্জিত ও সুনীতিশাসিত বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্যের বিনাশের সূচনা করলেন।

কিন্তু ঔরঙ্গজীব ও অশোকের সবচেয়ে গুরুতর পার্থক্য হচ্ছে তাঁদের ধর্মনীতিগত। ঔরঙ্গজীব ইসলামধর্মকে রাজধর্মের উপরে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর আদর্শ অনুসারে মুসলমান হিসাবে তাঁর যা কর্তব্য তাই ছিল মুখ্য এবং রাজকর্তব্য ছিল গৌণ। সুতরাং তাঁর জীবনে যখন ইসলামধর্ম ও রাজধর্মের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হল তখন তিনি স্বধর্মনিষ্ঠার কাছে প্রজাবাৎসল্যকে বলি দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি। তিনি যদি এদেশে নিছক ধর্মপ্রচারক দরবেশরূপে জীবনযাপন করতেন তাহলে সম্ভবত তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আদর্শ চরিত্র এবং গভীর শাস্ত্রজ্ঞান নিয়ে অসামান্য সাফল্য ও কীর্তি অর্জন করতে পারতেন। কিংবা তিনি যদি কোনো ইসলামধর্মাবলম্বী দেশে

---

১ ঔরঙ্গজীবের ধর্মের আদর্শ ছিল শিল্পরচনার বিরোধী, পক্ষান্তরে অশোকের ধর্মবোধই তাঁর সমস্ত শিল্পরচনার মূল প্রেরণা জুগিয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। "অশোকের রচিত স্তূপ ও স্তম্ভ বুদ্ধগয়ায় বোধিবটমূলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামান্য নহে। যে পুণ্যস্থানে ভগবান্ বুদ্ধ মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, রাজচক্রবর্তী অশোক সেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই, কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন" (সাহিত্য, সৌন্দর্যবোধ)।

রাজত্ব করতেন তাহলে হয়তো আদর্শ রাজা বলে গণ্য হতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় অমুসলমানপ্রধান দেশের রাজমুকুট শিরে ধারণ করাতেই তাঁর জীবনটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এইখানেই ঔরঙ্গজীবের তথা মোগলসাম্রাজ্যের ও ভারতীয় ইতিহাসের ট্র্যাজেডি।

অশোক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি ঔরঙ্গজীবের ন্যায় স্বীয় ব্যক্তিগত ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে (state religionএ) পরিণত করতে কখনও প্রয়াসী হননি। সুতরাং তাঁর জীবনে ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজধর্মের বিরোধঘটিত ট্র্যাজেডি দেখা দেয়নি। তিনি ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রনীতি থেকে পৃথক্ রেখে তাঁর রাজকীয় কর্তব্যতালিকায় প্রজাবাৎসল্যকেই সর্বপ্রধান স্থান দিয়েছিলেন এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তা যদি না হত তাহলে তৎকালীন অবৌদ্ধপ্রধান ভারতবর্ষে প্রচারলিপ্স বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের জীবনও ব্যর্থতার মধ্যে অবসিত হত।

পরধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ ধরে বিচার করলে শের শাহ, শিবাজী, কাশ্মীররাজ জৈন্থ-ল্ আবিদিন (১৪১৭-৬৭) এবং বিশেষভাবে আকবরের সঙ্গেই অশোকের তুলনা করা সমীচীন। জৈন্থ-ল্ আবিদিনের কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। আকবরের পূর্ববর্তী হলেও ধর্মনীতিগত উদারতা ও বিচক্ষণতায় তিনি আকবরের চেয়ে কিছুমাত্র হীন ছিলেন না। যা হোক এস্থলে আমরা পূর্বোক্ত তিনজনের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে আকবরের সঙ্গে অশোকের তুলনার কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করব। কেননা আমাদের পক্ষে সেইটাই অধিকতর ঔৎসুক্যের বিষয় ও শিক্ষাপ্রদ।

বস্তুত স্বধর্মনিষ্ঠ ঔরঙ্গজীবের চেয়ে সর্বধর্মনিষ্ঠ আকবরের সঙ্গেই

অশোকের সাদৃশ্য অনেক বেশি। সমরনিপুণ সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার উদ্ভাবক হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই আকবরের সঙ্গে অধিকতর তুলনীয়। কিন্তু ব্যক্তিগত অনালস্য বা শ্রমশীলতা, ইতিহাসরচনা ও শিল্পসৃষ্টির আগ্রহ, আন্তরিক প্রজাবাৎসল্য এবং বিশেষভাবে ধর্মনীতিগত উদারতার হিসাবে অশোক ও আকবরের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। অশোকের পূর্ববর্ণিত 'আত্মপাষণ্ডপূজা'- ও 'পরপাষণ্ডগর্হা'-বিষয়ক নীতি এবং আকবরের অনুসৃত 'সুল্‌হ্‌-ই-কুল্‌' (universal toleration, সর্বধর্মসহিষ্ণুতা) নীতি মূলত এক। ঔরঙ্গজীবের 'দারু-ল্‌-ইসলাম' (অর্থাৎ ইসলাম-রাজ) নীতি অশোক ও আকবর উভয়েরই আদর্শবিরোধী। অশোকের 'সমবায়ো এব সাধু' এই গুরুত্বময় উক্তিটি আকবরের 'ইবাদৎখানা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আকবরের ইবাদৎখানায় (উপাসনাগৃহে) হিন্দু, মুসলমান, জৈন ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়েব নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতগণ একত্র সমবেত হয়ে ধর্মালোচনা করতেন। তাতে প্রত্যেক ধর্মের লোকের পক্ষেই 'বহুশ্রুত' হয়ে অপরাপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা সহজ হবে, এই ছিল আকবরের অন্যতম অভিপ্রায়। অশোককথিত সমবায়ের উদ্দেশ্যও ছিল ঠিক এইরূপেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করা। বহু ধর্মের সংস্পর্শে এসে আকবরের মনে সমস্ত ধর্মের সার সংগ্রহ করে এবং তারই উপর জোর দিয়ে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক ঐক্যস্থাপন করার ইচ্ছা দেখা দিয়েছিল। তার ফলেই 'দীন ইলাহী' নামক নবধর্মের পরিকল্পনা হয়। অশোকও পুনঃপুন সর্বধর্মের সারবৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু আকবরের ন্যায় তিনি এই সারধর্মকে কোনো নবধর্মের আকার দিতে প্রয়াসী হননি।

পক্ষান্তরে তিনি তাকে স্পষ্টতই 'পোরাণা পকিতী' অর্থাৎ চিরন্তন ধর্মনীতি বলেই অভিহিত করেছেন। তাছাড়া আকবরের দীন ইলাহী অশোকপ্রশংসিত ধর্মের ছায় নিছক চারিত্রনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং তাতে অনুষ্ঠানাদিরও স্থান ছিল। কিন্তু অশোকের ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার স্থান নেই; বরং তিনি নিরর্থক অনুষ্ঠানের ('মঙ্গল') অপ্রশংসাই করেছেন। সর্বশেষ কথা এই যে, ধর্মসমবায়নীতির সাহায্যে সর্বসম্প্রদায় তথা সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার এই যে অপূর্ব সাধনা, তা অশোক এবং আকবর উভয়ের ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যর্থতার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। সে ব্যর্থতা শুধু অশোক এবং আকবরের পক্ষে নয় পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষেই এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। ভারতইতিহাসের এই করুণতম ট্র্যাজেডির কথা পরের অধ্যায়ে আলোচিত হল।

ধর্মনীতির পরিণাম

১

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মৌর্যসাম্রাজ্যের গুরুত্ব অবিসংবাদিত। বাহুবলে ও শাসননৈপুণ্যে, ধর্মবিস্তারে ও প্রজারঞ্জনে, ঐশ্বর্যে ও শিল্পে, এবং সর্বোপরি বহির্জগতের সঙ্গে যোগস্থাপনে ও বৈদেশিক শক্তির শ্রদ্ধাঅর্জনে মৌর্যসাম্রাজ্যের গৌরব ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতুলনীয়। বৈদিক যুগ থেকে যে আর্য্যসভতা ক্রমবিস্তার লাভ করতে করতে ভারতীয় সভ্যতার রূপ ধারণ করছিল, তার পূর্ণ পরিণতি ঘটে মৌর্যযুগে। আর, এদেশের ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রগঠনপ্রচেষ্টাও এই যুগেই পূর্ণ সাফল্য লাভ করে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। বস্তুত সংস্কৃতির বিস্তার ও রাষ্ট্রগৌরব, এই উভয় দিক্ দিয়েই এই যুগ হচ্ছে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অভ্যুদয়ের সর্বোচ্চ সীমা। এই অভ্যুদয়ের চরম পরিণতি ঘটেছিল প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকালে। আর, অশোক হচ্ছেন শুধু ভারতবর্ষের নয় পরন্তু সমগ্র পৃথিবীরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্। অথচ এই অশোকের রাজত্বের অত্যল্পকাল পরেই মৌর্যসাম্রাজ্যের বিনাশের সূচনা হয়। মৌর্যযুগের পর ভারতবর্ষের ইতিহাস আর কখনও অনুরূপ সর্বাঙ্গীণ গৌরবের অধিকারী হয়নি। সুতরাং অশোকের রাজত্বকালের পর এত শীঘ্র মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন ঘটল কেন, এইটে স্বভাবতই ঐতিহাসিকগণের বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় এবং আমাদের পক্ষেও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

২

মৌর্যসাম্রাজ্যের অবনতি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির কতকগুলি কারণ অতি সুস্পষ্ট। এস্থলে সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলেই নিরস্ত হব।

প্রথমত, উক্ত সাম্রাজ্যের অতিবিশালতাই তার পতনের অন্যতম কারণ। তখনকার দিনে অত বড়ো প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যকে এক কেন্দ্রের আয়ত্তে রাখা ও তার সমস্ত প্রান্তে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য ছিল না। সে যুগে রাজপথের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল বটে, কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক রাজপথের রজ্জুবন্ধনে সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রান্ত রাজধানী পাটলিপুত্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বাঁধা পড়েছিল কিনা সন্দেহ। 'All roads lead to Rome'এর অনুরূপ উক্তি পাটলিপুত্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলে মনে হয় না। আর, বহুসংখ্যক রাজপথ থাকলেও আধুনিক কালের ন্যায় দ্রুতগতি যানবাহনের অভাবে তৎকালে অত বড়ো সাম্রাজ্যকে যথোচিতরূপে কেন্দ্রানুগত করে রাখা সম্ভব ছিল না। রাজধানী পাটলিপুত্রের ভৌগোলিক অবস্থিতিও সাম্রাজ্যের সর্বাংশের আনুগত্য বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল ছিল বলে বোধ হয় না। রাজধানী যদি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে কিংবা আশঙ্কিত বিপৎস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত হত তাহলে হয়তো উক্ত সাম্রাজ্যের বিনাশ অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত হত।

দ্বিতীয়ত, রাজকুমারগণের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য- ও রাজত্ব-লিপ্সা। অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই জলৌক নামক তাঁর এক পুত্র কাশ্মীরে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসেন নামক অপর এক পুত্রও সম্ভবত গন্ধারে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। একথা

নিশ্চিত যে খ্রী পূ ২০৬ অব্দের পূর্বেই সুভাগসেন নামক এক শক্তিশালী রাজা (সম্ভবত উক্ত বীরসেনের বংশধর) ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন। রাজকুমারগণের এরকম স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস থেকে অশোকের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আত্মকলহের কথাও অনুমান করা যায়। অশোক নিজেও ভ্রাতৃ-কলহে জয়লাভ করে সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন, বৌদ্ধ সাহিত্যে একথার উল্লেখ আছে।

তৃতীয়ত, অশোকের পরবর্তী মৌর্য রাজাদের অনেকেই যে দুর্বল, রাজপদের অযোগ্য ও প্রজাপীড়ক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ বা জৈন সাহিত্যে তাঁদের গৌরবকাহিনী প্রায় নেই বললেই হয়, যা আছে তাও অতি নগণ্য। তাঁদের রাজত্বকালের কোনো শিল্পনিদর্শন বা শিলালিপি পাওয়া যায়নি। নাগার্জুনি পর্বতে অশোকের পৌত্র দশরথের যে তিনখানি লিপি পাওয়া গিয়েছে তার অসৌষ্ঠব লক্ষ্য করার বিষয়। এসব কারণে মনে হয় এঁদের রাজত্বকালে অশোকের আমলের ঐশ্বর্য ও শিল্প-গৌরব অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। অশোকের অন্যতম বংশধর (সম্ভবত প্রপৌত্র) শালিশুক সম্বন্ধে গার্গীসংহিতায় বলা হয়েছে 'স্বরাষ্ট্রং মর্দতে ঘোরং ধর্মবাদী অধার্মিকঃ'। শেষ মৌর্যরাজ বৃহদ্রথও নিতান্ত অকর্মণ্য ছিলেন এবং সৈন্যপরিচালনার ভার সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই সুযোগে সেনাপতি পুষ্যমিত্র সৈন্যদলের সম্মুখেই তাঁকে নিহত করে সিংহাসন অধিকার করেন।

চতুর্থত, প্রান্তবর্তী অচিরবিজিত প্রদেশগুলির পুনঃস্বাতন্ত্র্যলাভের স্বাভাবিক ইচ্ছাও সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে ভাঙন ধরার অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই। কাশ্মীর, গন্ধার, বিদর্ভ, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদ অশোকের

অত্যল্প কাল পরেই স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই রাজপুরুষগণের উৎপীড়ন ও তজ্জনিত বিদ্রোহের ফলেই এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একথা মনে করার হেতু আছে। দিব্যাবদান গ্রন্থে দেখা যায়, একবার বিন্দুসারের আমলে এবং আরেকবার অশোকের আমলেই তক্ষশিলা নগরে দুষ্টামাত্যগণের উৎপীড়ন ('পরিভব') ও অপমানের ফলে প্রজাবিদ্রোহ ঘটেছিল। অশোকের শিলালিপিতেও তোসলী (কলিঙ্গে), উজ্জয়িনী এবং তক্ষশিলায় মহামাত্রগণের অত্যাচারের উল্লেখ আছে। অশোক অবশ্য এই অত্যাচার নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন এবং হয়তো অনেকটা সাফল্য লাভও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীরা অত্যাচারী অমাত্যগণকে দমন করতে সমর্থ হননি বলেই মনে হয়।

যখন এই সমস্ত অকর্মণ্য রাজাদের শিথিল মুষ্টি থেকে চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের পরিচালিত রাজদণ্ড স্খলিতপ্রায় হয়ে এসেছিল তখন একদিকে রাজ্যলিপ্সু সেনাপতি পুষ্যমিত্র এবং অপরদিকে বিজয়কামী 'দুষ্টবিক্রান্ত' ও 'যুদ্ধদুর্মদ' যবনগণের আক্রমণে মৌর্যসাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সাম্রাজ্যের শক্তিকেন্দ্রস্বরূপ রাজধানী যদি বৈদেশিক আক্রমণকারীদের প্রবেশপথের নিকটে অবস্থিত হত তাহলে হয়তো ভারতবর্ষে যবনবিজয় এত সহজসাধ্য হত না।

৩

অশোকের অবলম্বিত শাসননীতিও মৌর্যসাম্রাজ্যের অবনতির কতকটা সহায়তা করেছে বলে অনুমিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর প্রায়

সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরেছিল, এর থেকে স্বভাবতই মনে হয় এ বিষয়ে তাঁর দায়িত্বও সম্ভবত কম নয়। 'রাজূক' নামক একশ্রেণীর প্রচুর ক্ষমতাশালী রাজপুরুষকে অনেকখানি স্বাতন্ত্র্য ও বহুশতসহস্র প্রজার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। একশ্রেণীর বিশিষ্ট কর্মচারীকে এতখানি ক্ষমতা, স্বাতন্ত্র্য এবং এত বেশি লোকের উপর আধিপত্য করার সুযোগ দান রাজ্যের সংহতি রক্ষার পক্ষে খুব সম্ভব অনুকূল হয়নি এবং অশোকের পরবর্তী দুর্বল রাজাদের পক্ষে ওই রাজূকগণকে সংযত রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল, এমন অনুমান করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, অশোক ছিলেন দানে মুক্তহস্ত। তাঁর শিলা-লিপিতেও পুনঃপুন দানের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। দরিদ্রকে ভিক্ষাদান, ব্রাহ্মণশ্রমণকে অর্থদান, স্থবিরদিগকে হিরণ্যদান, সর্বধর্ম-সম্প্রদায়কে সাহায্যদান, আজীবিকদের উদ্দেশ্যে গুহাদান, বুদ্ধের জন্মভূমির সম্মানার্থে লুম্বিনী গ্রামকে রাজস্ব ('বলি' ও 'ভাগ') থেকে মুক্তিদান প্রভৃতি কার্যে অশোক নিশ্চয়ই বিস্তর অর্থব্যয় করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে হর্ষবর্ধনের অতিদানপরায়ণতার কথাও স্মরণীয়। তাছাড়া দেশে ও বিদেশে মানুষ ও পশুর চিকিৎসাব্যবস্থা এবং ভেষজ সংগ্রহ ও রোপণ, রাজপথে বৃক্ষরোপণ, কূপখনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য, সর্বধর্মের সারবর্ধনার্থ ধর্মমহামাত্রাদি নিয়োগ, নানা দেশে দূতপ্রেরণ, রাজ্যের সর্বত্র পর্বতে স্তম্ভে ও ফলকে ধর্মলিপি উৎকিরণ এবং নানাবিধ শিল্পপ্রচেষ্টায় চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের সঞ্চিত অর্থ নিশ্চয়ই অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল এবং তাতে সাম্রাজ্যের আর্থিক শক্তির অনেকখানি ক্ষতি হয়েছিল, এমন অনুমান করা অসংগত নয়। কিন্তু অশোকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ এই যে, কলিঙ্গবিজয়ের পরে তিনি যে সংগ্রামবিমুখতার নীতি

অবলম্বন করলেন তার ফলে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছিল। তাতে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বৈদেশিক আক্রমণ, দুটোই সহজসাধ্য হয়েছিল। পূর্বে দেখিয়েছি যে অশোক সর্বপ্রকার যুদ্ধেরই বিরোধী ছিলেন না। তিনি রাজ্যবিস্তারমূলক যুদ্ধেরই বিরোধী ছিলেন, কিন্তু রাজ্যরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন।[১] তিনি তাঁর সেনাদলকে একেবারে ভেঙে দিয়েছিলেন একথা মনে করার কোনো কারণ নেই; শেষ মৌর্যরাজ বৃহদ্রথের সেনাদলের কথা সুবিদিত। কিন্তু একথা সত্য যে কলিঙ্গযুদ্ধের পরে তাঁর মন যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি একান্তরূপেই বিমুখ হয়ে উঠেছিল এবং নিজে দিগ্‌বিজয়নীতি পবিহার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি; তাঁর পুত্রপ্রপৌত্রেবাও যেন ভবিষ্যতে নবরাজ্যবিজয়ের আকাঙ্ক্ষা মনে স্থান না দেন সে ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করে গিয়েছেন। সুতরাং যে সামরিক শক্তির সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্যেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অশোক সেই সামরিক শক্তিকে অবহেলা করে সাম্রাজ্যের বিনাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

৪

কিন্তু এগুলি হচ্ছে বাহ্য কারণ। এর চেয়ে গভীরতর কোনো কারণ আছে কিনা এবং মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে অশোকের অনুসৃত ধর্মনীতির কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিনা তাও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বহুকাল পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই

১ পৃ ৪০ দ্রষ্টব্য।

অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে অশোকের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণগণের প্রবল প্রতিক্রিয়া ও বিদ্রোহের ফলেই মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তিনি এই পতনকে একটি বিরাট্ রাষ্ট্রবিপ্লব-(great revolution-)এর ফল বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর মতে ওই বিপ্লবের নায়ক ছিলেন ব্রাহ্মণসেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ। ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এই অভিমতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, The theory which ascribes the decline and dismemberment of the Maurya Empire to a Brahmanical revolution led by Pushyamitra does not bear scrutiny.[১]

অশোকের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ব্রাহ্মণগণ এক বিপ্লব বাধিয়েছিলেন এবং তারই ফলে মৌর্যসাম্রাজ্যের অবসান ঘটে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই বটে, কিন্তু একথাও বোধকরি অস্বীকার করা যায় না যে তৎকালীন বেদমার্গী ব্রাহ্মণগণ মৌর্য-সম্রাট্গণের (বিশেষত অশোকের) প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না এবং তাঁদের ওই অপ্রসন্নতা উক্ত সাম্রাজ্যের পতনের পক্ষে আনুকূল্য করেছিল। কথাটা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

আধুনিক কালের দেশী এবং বিদেশী সমস্ত ঐতিহাসিকই অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে থাকেন। তাঁদের মতে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেই অশোকের মতো আদর্শ রাজার দৃষ্টান্ত বিরল। সুবিখ্যাত *'Outline of History'*-রচয়িতা এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌এর মতে অশোক ছিলেন 'one of the greatest monarchs of history'। অশোকের কৃতিত্ব সম্বন্ধে ওয়েল্‌স্‌ বলেছেন, He is the only military monarch on record who

১ *Political History of Ancient India* ৪র্থ সং পৃ ৩০১।

abandoned warfare after victory...He made— he was the first monarch to make— an attempt to educate his people into a common view of the ends and way of life...Asoka worked sanely for the real needs of men. অতঃপর পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের স্থাননির্ণয় উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন, Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history...the name of Asoka shines, and shines almost alone, a star. From the Volga to Japan his name is still honoured. China, Tibet ...preserve the tradition of his greatness. More living men cherish his memory today than have ever heard the names of Constantine or Charlemagne. ওয়েল্‌স্‌ সাহেবের এই উক্তির সত্যতা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই।

যেসব রাজারা সমকালীন জনসাধারণের চিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন এবং পরবর্তী কালেও যুগে যুগে বহুসংখ্যক নরনারীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকেন তাঁদেরই আমরা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে থাকি। এঁদের ঐতিহাসিক স্বরূপ কালে কালে বিকৃত হলেও দেশের সাহিত্যে, কাহিনীতে ও কিংবদন্তীতে এঁদের মহত্ত্ব চিরজীবী হয়ে থাকে। য়ুরোপের শার্লেমঁা, আরবের হারুন-অল রসিদ এবং ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্যের কালজয়ী মহত্ত্ব উক্তপ্রকার জনপ্রসিদ্ধির ভিতর দিয়েই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। রাজোচিত মহত্ত্বের বিচারে সম্রাট্ অশোকের গৌরব এঁদের কারও চেয়ে কম নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁর রাজমহিমা সত্যই অতুলনীয়। সুতরাং জনপ্রসিদ্ধিতে অশোকের স্থান বিক্রমাদিত্যের চেয়ে কম হবে না

এটাই স্বভাবত মনে হয়। কিন্তু একথা সুবিদিত যে অশোকের স্মৃতি ভারতবর্ষের জনশ্রুতি থেকে প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অথচ জনমেজয় পরীক্ষিৎ বা জনকের খ্যাতি আজও এদেশের জনস্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে। এই উক্তিটিকে একটু সংশোধন করে বলা উচিত যে বৌদ্ধ জগতে অর্থাৎ চীনে তিব্বতে ব্রহ্মে সিংহলে অশোকের স্মৃতি জনচিত্তে এখনও জীবন্ত রয়েছে এবং সে স্মৃতি নিছক স্মৃতিমাত্র নয়, পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ স্মৃতি; কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য সমাজ থেকে সে স্মৃতি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এর থেকে মনে হয় উক্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজ সম্ভবত কোনো কালেই অশোক সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেনি।

৫

এবিষয়ে প্রাচীন সাহিত্যে কি পাওয়া যায় বিচার করে দেখা যাক। প্রথমেই দেখি দীপবংস, মহাবংস, দিব্যাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে অশোকের কীর্তিকাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত বা অতিরঞ্জিত হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য অশোক সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নীরব। পুরাণের বংশতালিকায় অবশ্য অশোকের নাম আছে, কিন্তু সে উল্লেখ শুধু নামমাত্রই। পুরাণে তার চেয়ে বেশি আশাও করা যায় না। অন্যত্র মৌর্যবংশ তথা অশোক সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে গভীর অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। মহাপরিনিব্বানসুত্ত, মহাবংস, দিব্যাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে মৌর্যদের ক্ষত্রিয় বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য পুরাণসাহিত্যে মৌর্যদিগকে কোনো কোনো স্থলে ‘শূদ্রযোনি’ এবং অন্যত্রে ‘শূদ্রপ্রায়

অধার্মিক' বলে কলঙ্কিত করা হয়েছে। 'শূদ্রপ্রায়' কথার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় মৌর্যরা বস্তুতই শূদ্র ছিলেন না; ব্রাহ্মণদের বিচারে 'অধার্মিক' বলেই তাঁদের শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে 'বৃষল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মনুসংহিতার (১০।৪৩) মতে শাস্ত্রনির্দিষ্ট 'ক্রিয়ালোপ'- এবং 'ব্রাহ্মণাদর্শন'-বশত ধর্মভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়কে বৃষল বলে অভিহিত করা যায়। মহাভারতে স্পষ্টই বলা হয়েছে—

যস্মিন্ ধর্মো বিরাজেত তং রাজানং প্রচক্ষতে।
যস্মিন্ বিলীয়তে ধর্মস্তং দেবা বৃষলং বিদুঃ॥
বৃষোহি ভগবান্ ধর্মো যস্তস্য কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুঃ ··· ··· ·· ॥

—শান্তিপর্ব ৯০।১৪-১৫

অর্থাৎ যে রাজাতে ধর্ম বিরাজমান থাকে তাঁকেই যথার্থ রাজা বলা হয়, আর যাঁর থেকে ধর্ম বিলুপ্ত হয় তিনি বৃষল নামে বিদিত। ভগবান্ ধর্মই বৃষ, যিনি সেই ধর্মকে ত্যাগ বা ব্যর্থ (অলম্) করেন তাঁকে বৃষল বলা হয়। এই উক্তির শেষাংশটি মনুসংহিতাতেও (৮।১৬) ধৃত হয়েছে। অতএব এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ব্রাহ্মণস্বীকৃত ধর্মকে যাঁরা মানতেন না ব্রাহ্মণদের মতে তাঁরাই বৃষল। বৌদ্ধসাহিত্যে (সংযুত্তনিকায় ১।১৬২) দেখা যায় সমসাময়িক ব্রাহ্মণরা বুদ্ধকেও 'বৃষল' বলে নিন্দা করতেন। চন্দ্রগুপ্তের বৃষল অভিধা থেকে অনুমিত হয় যে তিনি ক্ষত্রিয় হয়েও ব্রাহ্মণোপদিষ্ট ধর্মকে স্বীকার করেননি। এই প্রসঙ্গে ডক্টর রায়চৌধুরী বলেছেন, The Mauryas by their Greek connection and Jain and

Buddhist leanings certainly deviated from the *Dharma* as understood by the great Brahmana lawgivers.[১]

জৈনসাহিত্যে চন্দ্রগুপ্তকে নিষ্ঠাবান্ জৈন বলে বর্ণনা করা হয়; তাছাড়া যবনরাজ সেলুকসের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্কের কথাও সুবিদিত। আর অশোকের বৌদ্ধধর্ম অবলম্বনের কথা তো বলাই বাহুল্য। সুতরাং ব্রাহ্মণরা যে তাঁদের 'বৃষল' এবং 'শূদ্রপ্রায় অধার্মিক' বলে নিন্দা করবেন এটা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

একটু পূর্বেই বলেছি গৌতম বুদ্ধকেও তৎকালীন ব্রাহ্মণরা বৃষল বলে অপভাষণ করতেন। কিন্তু বৈদিক ধর্মত্যাগী বুদ্ধকে শুধু বৃষল বলেই ব্রাহ্মণদের আক্রোশ মেটেনি। তাঁকে 'চোর' বলে গালাগালি করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি। রামায়ণে বলা হয়েছে—

যথা হি চৌরঃ স তথাহি বুদ্ধ
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাম্
স নাস্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্যাং॥

—অযোধ্যাকাণ্ড ১০৯।৩৪

ভাগবত পুরাণেও এই বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে—

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষান্।
বুদ্ধনাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥

—ভাগবত ১।৩।২৪

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণদের মতে সুরদ্বেষীদের মোহ ঘটাবার জন্যেই বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুরদ্বিষ্ মানে দেবতাদের শত্রু অর্থাৎ

---

১ *Political History* চতুর্থ সং পৃ ২১৫।

অসুর। উদ্ধৃত শ্লোকটিতে বৌদ্ধরা সুরদ্বিষ্ বা অসুর বলে নিন্দিত হয়েছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণদের এই যে বিদ্বেষ তা বুদ্ধের আবির্ভাবকাল থেকে শুরু করে এদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত কখনও নিরস্ত হয়নি। এই বিদ্বেষের সংস্কার আমাদের সামাজিক মন থেকে এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। আধুনিক কালে ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে যে কঠোর মনোভাব দেখা দিয়েছিল, তৎকালে বৌদ্ধদেরও অনুরূপ মনোভাবের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিদ্বেষময় কঠোর মনোভাবের অবিশ্রান্ত আঘাতে পরাভূত হয়েই বৌদ্ধধর্ম অবশেষে এদেশ থেকে তিরস্কৃত হয়েছে। আমাদের দেশে য়ুরোপের ন্যায় রক্তপাতময় ধর্মসংগ্রাম হয়নি এবং রাজা তথা রাষ্ট্রশক্তি সাধারণত কোনো প্রকার ধর্মদ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করতেন না একথা সত্য। কিন্তু পরধর্মসহিষ্ণুতা আমাদের সামাজিক চিত্তে বা সাহিত্যে কখনও সম্পূর্ণ প্রাধান্য পায়নি। ধর্মত্যাগীদের সংশ্রব বর্জন ও তাদেব একঘরে করাব মনোবৃত্তিই আমাদের সমাজকে পরিচালিত করেছে। সমগ্র ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের গুণগ্রাহিতার দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল, পক্ষান্তরে বৌদ্ধবিরোধী মনোভাবের দৃষ্টান্ত ও-সাহিত্যে প্রচুরপরিমাণেই পাওয়া যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে উক্ত ধর্মগুলির পারস্পরিক কলহের কথা ইতিহাসজ্ঞের অবিদিত নয়। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব ধর্মের কলহও সর্বজনবিদিত, আজও তার সম্পূর্ণ অবসান ঘটেনি। তাই বলছিলাম পরধর্মসহিষ্ণুতা আমাদের সামাজিক মনের বিশিষ্ট লক্ষণ নয় এবং ব্রাহ্মণ্য অসহিষ্ণুতাই বৌদ্ধধর্মকে অবশেষে দেশছাড়া করে ছেড়েছে।

ভিক্ষুব্রতী বুদ্ধ যখন ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হলেন তখন ব্রাহ্মণ গৃহস্থ তাঁকে ভিক্ষা তো দিলেনই না, অধিকন্তু গালাগালি করে বিদায়

করলেন, এমন ঘটনা সেই প্রাচীনকালেও বিরল ছিল না।[১] বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্ত বুদ্ধকে নিহত করার ষড়্‌যন্ত্র করে রাজা অজাতশত্রুর সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন এবং রাজাও তাতে সম্মত হয়েছিলেন, এ ইতিহাস আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।[২] মহাবস্তু-অবদান প্রভৃতি পরবর্তী কালের বৌদ্ধগ্রন্থেও ব্রাহ্মণদের বৌদ্ধনির্যাতনের কাহিনী আছে। তথ্য হিসাবে এসব কাহিনী সত্য না হলেও এগুলির মূলে কিছু সত্য আছে একথা অস্বীকার করা যায় না।[৩] বহু পরবর্তী কালেও যে এ মনোভাবের অবসান ঘটেনি তার প্রমাণ আছে। রাজা হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখিয়েছিলেন বলে ব্রাহ্মণগণ তাঁর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। শুধু তাই নয়, পাঁচশো ব্রাহ্মণ ষড়্‌যন্ত্র করে হর্ষবর্ধনের নির্মিত একটি সংঘারামে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং রাজাকে হত্যা করতেও চেষ্টা করে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থসাঙ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, তাঁর গ্রন্থে এর যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়[৪] তার সত্যতা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। কুমারিলভট্ট ও শঙ্করাচার্যের বৌদ্ধবিরোধী প্রচারকার্যের ইতিহাসও সর্বজনবিদিত। যাহোক, অজাতশত্রুর আমল থেকে শঙ্করাচার্যের সময় পর্যন্ত এই যে ধারাবাহিক বৌদ্ধবিরোধী মনোভাব, অশোকের রাজত্বকালে তা অবিদ্যমান বা নিষ্ক্রিয় ছিল একথা মনে করার কোনো কারণ নেই।

---

১ Mookerji, *Hindu Civilization* পৃ ২৬৪।

২ ঐ, পৃ ১৯৩-৯৪।

৩ রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রণীত *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* পৃ ১২১ দ্রষ্টব্য।

৪ Beal, Si-yu-ki ১ম খণ্ড পৃ ২১৯-২১।

৬

আমরা দেখেছি ভাগবত পুরাণে বৌদ্ধদের সুরদ্বিষ্ বা অসুর বলে নিন্দা করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৮৮।৫) মৌর্যবংশকেই অসুর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বে (৬৭।১৩-১৪) অশোককে এক মহাসুরের অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধদের এই যে সুরদ্বিষ্ বা অসুর বলে অভিহিত করা হয়েছে তার কারণ তাঁরা ব্রাহ্মণানুমোদিত দেবপূজার সমর্থক ছিলেন না। অশোক কিন্তু বৌদ্ধধর্ম অবলম্বনের পরেও স্বীয় 'দেবানং পিয়' উপাধি পরিত্যাগ করেননি। অশোকের শিলালিপিতে কোথাও দেবগণের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের উপদেশ না থাকলেও এবং বিশেষভাবে অব্রাহ্মণ্যদের জন্ম রচিত কয়েকটি লিপিতে (যেমন বৌদ্ধসংঘের উদ্দেশ্যে রচিত ভাব্রু ফলকলিপিতে এবং আজীবিক সন্ন্যাসীদের জন্যে রচিত তিনটি গুহালিপিতে) ওই উপাধি ব্যবহার না করলেও অধিকাংশ স্থলেই ওই উপাধির উল্লেখ দেখা যায়। সিংহলের বৌদ্ধ রাজা তিস্স এবং অশোকের পৌত্র দশরথও ওই উপাধি ব্যবহার করতেন। কিন্তু দেবপূজাবিরোধী বৌদ্ধরাজার 'দেবানাং প্রিয়ঃ' উপাধি ব্রাহ্মণদের নিশ্চয়ই ভালো লাগেনি। সেজন্যে তাঁরা 'আক্রোশ'বশত বিদ্রূপ করে 'দেবানাং প্রিয়ঃ' কথার অর্থ করলেন 'মূর্খ'। "ষষ্ঠ্যা আক্রোশে" অর্থাৎ আক্রোশ বোঝাতে হলে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হবে না, পাণিনিব্যাকরণের অলুক্‌সমাস-প্রকরণের এই সূত্রের (৬।৩।২১) কাত্যায়নকৃত 'দেবানাং প্রিয় ইতি চ মূর্খে'—এই বার্তিক থেকে উক্ত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে। হতে পারে এই বৈয়াকরণিক অর্থান্তরসাধন পরবর্তী কালের, অর্থাৎ অশোকের সমকালীন নয়। কিন্তু আক্রোশটা যদি 'দেবানাং প্রিয়'দের আমল থেকেই

চলে না। আসত তাহলে পরবর্তী কালেও ওরকম অর্থবিকৃতি হতে পারত না। কাত্যায়ন সম্ভবত অশোকের সমকালীন কিংবা তাঁর অল্প পরবর্তী ছিলেন।[১]

অশোকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আরেকটি শব্দ হচ্ছে 'পাষণ্ড'। সাধারণভাবে যে-কোনো ধর্মসম্প্রদায় অর্থেই তিনি ওই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পালিসাহিত্যেও পাষণ্ড শব্দের ওই অর্থই দেখা যায়। অশোকের দ্বাদশ গিরিলিপির গোড়াতেই আছে 'দেবানং পিয়ে পিয়দসি রাজা সব পাসংডানি···পূজয়তি', অর্থাৎ দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) সব সম্প্রদায়- ('পাষণ্ড'-)কেই (সমভাবে) সম্মান ('পূজা') করেন। কিন্তু মনুসংহিতায় (৪।৩০) বলা হয়েছে "পাষণ্ডিনো···শঠান্ হৈতুকান্··· বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ', অর্থাৎ পাষণ্ডী, শঠ এবং হৈতুকদের বাঙ্‌মাত্রের দ্বারাও সংবর্ধনা ('অর্চনা', কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যায় 'পূজা') করবে না। মনুসংহিতার অন্যত্র (৯।২২৫) আছে, "ক্রূরান্ পাষণ্ডস্থাংশ্চ মানবান্··· ক্ষিপ্রং নির্বাসয়েৎ পুরাৎ', অর্থাৎ ক্রূর এবং পাষণ্ডস্থ লোকদের ত্বরায় পুর থেকে নির্বাসিত করবে। কুল্লুকভট্টের টীকা অনুসারে পাষণ্ডিনঃ = বেদবাহ্যব্রতলিঙ্গধারিণঃ শাক্যভিক্ষুক্ষপণকাদয়ঃ, শঠাঃ = বেদেষশ্রদ্ধধানাঃ, হৈতুকাঃ = বেদবিরোধিতর্কব্যবহারিণঃ, ক্রূরাঃ = বেদবিদ্বিষঃ, পাষণ্ডস্থাঃ = শ্রুতিস্মৃতিবাহ্যব্রতধারিণঃ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মনু- ও কুল্লুকভট্ট-চালিত ব্রাহ্মণ্যসমাজে বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে কিরূপ কঠোর অবজ্ঞার ভাব পোষণ করা হত। এই তীব্র ঘৃণার মনোভাব থেকেই পাষণ্ড শব্দের এরকম অর্থাবনতি ঘটেছে সন্দেহ নেই। যাদের কাছে পাষণ্ড শব্দের এরকম হীনার্থ তাদের কাছে যে-'দেবানং পিয়' সব 'পাষণ্ড'কেই পূজা করেন তিনি যে 'মূর্খ' রূপেই প্রতিভাত হবেন এটা বিস্ময়ের বিষয় নয়।

১ Keith, *Sanskrit Literature* পৃ ৪২৬।

যে মনোবৃত্তির ফলে বুদ্ধকে বৃষল ও চোর বলে গালাগালি করা হয়েছে, বৌদ্ধদের অসুর ক্রূর শঠ প্রভৃতি বিশেষণে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, তাদের বাঙ্‌মাত্রের দ্বারাও সংবর্ধনা করা নিষিদ্ধ হয়েছে এবং গ্রাম বা নগর (পুর) থেকে নির্বাসনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, সে মনোবৃত্তি নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ রাজা অশোকের ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে সহসা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল একথা মনে করার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। আমরা জানি অশোক নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও তিনি জনসাধারণের কাছে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন একথা বলা যায় না। সর্বধর্মের 'সার' বস্তুকেই তিনি 'ধর্ম' বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং এই সারধর্মের দ্বারা স্বদেশের ও বিদেশের জনচিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ করাকেই তিনি 'ধর্মবিজয়' নামে অভিহিত করেছিলেন। এই ধর্মবিজয়ের আদর্শটিও ব্রাহ্মণগণের মনঃপূত হয়নি।[১] গার্গীসংহিতায় স্পষ্টই বলা হয়েছে, "স্থাপয়িষ্যতি মোহাত্মা বিজয়ং নাম ধার্মিকম্"। অশোকের প্রতি প্রযুক্ত 'মোহাত্মা' বিশেষণটি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত পূর্বোদ্ধৃত ভাগবত পুরাণের 'সম্মোহ' শব্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া এই 'মোহাত্মা' বিশেষণ এবং 'দেবানাং প্রিয়ঃ' কথার মূর্খবাচক অর্থস্বীকার মূলত একই মনোভাবের পরিচায়ক।

অশোককথিত 'ধর্ম'কে ব্রাহ্মণরা কখনও স্বীকার করতে পারেননি, কেননা সে ধর্ম বেদমূলক ছিল না। মনুর 'বেদোঽখিলোধর্মমূলম্' উক্তিটি স্মরণীয়। বস্তুত তাঁদের মতে অশোক ছিলেন 'অধার্মিক'। পূর্বোদ্ধৃত 'শূদ্রপ্রায়াস্ত্বধার্মিকাঃ' এই পুরাণোক্তি এবং মনু ও মহাভারতে স্বীকৃত বৃষল শব্দের অর্থ স্মরণীয়। অথচ তিনি তাঁর অনুশাসনগুলিতে পুনঃপুন ধর্মের মহিমা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং অশোকের প্রপৌত্র শালিশুকের সম্বন্ধে উক্ত 'ধর্মবাদী অধার্মিকঃ' বিশেষণটি ব্রাহ্মণদের অভিমতে অশোকের প্রতিও

১ পৃ ২১-২২ দ্রষ্টব্য।

সমভাবে প্রযোজ্য। শালিশুক ছিলেন খুব সম্ভবত অশোকের পৌত্র 'সম্প্রতি'র পুত্র ও উত্তরাধিকারী। আর সম্প্রতি ছিলেন নিষ্ঠাবান্ জৈন। তৎপুত্র শালিশুক অশোকের স্থায় 'ধর্ম' প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন কিনা এবং তজ্জন্যই তাঁকে 'ধর্মবাদী অধার্মিক' বলা হয়েছে কিনা নিঃসন্দেহে বলার উপায় নেই।

৭

যাহোক, শুধু যে বেদমার্গী ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ই অশোক ও তাঁর ধর্মনীতির উপর অপ্রসন্ন ছিলেন তা নয়। বেদ- ও ব্রাহ্মণ-বিরোধী ভাগবতসম্প্রদায়ও এসময়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অশোক-প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, ঐতিহাসিকরা এরকম অনুমান করেন। ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেছেন, The earlier Brahmanical attitude towards the faith (Bhagavatism) was one hostility, but later on there was a combination between Brahmanism and Bhagavatism probably owning to the Buddhist propaganda of the Mauryas [১]

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই মতের সমর্থক। ব্রাহ্মণ্য ও ভাগবত সম্প্রদায়ের এই সহযোগিতা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, The advance might have been made by the Brahmans themselves, as a protection against Buddhism, which grew

১ *Early History of the Vaishnava Sect* ২য় সং পৃ ৬-৭।

predominant under the patronage of Asoka...The reconciliation with orthodox Brahmanism...gave a new turn to the latter. Henceforth Bhagavatism, or as it may now be called by its more popular name, Vaishnavism, formed, with Saivism, the main plank of the orthodox religion in its contest with Buddhism.[১]

ভাগবত ধর্মের সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান গ্রন্থ ভগবদ্‌গীতাও এই সময়েই অর্থাৎ অশোকের রাজত্বের কাছাকাছি সময়েই রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।[২] কাজেই গীতাতেও বৌদ্ধ-ভাগবত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছু আভাস থাকা বিচিত্র নয়। এই দৃষ্টি নিয়ে সন্ধান করলে গীতা থেকে কিছু কিছু বৌদ্ধবিরোধী উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। যেমন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩।৩৫

গীতার এই বিখ্যাত শ্লোকটিতে বৌদ্ধধর্মের তৎকালীন প্রবল অগ্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার আভাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই শ্লোকের প্রথমাংশটি অন্যত্র (১৮।৪৭) হুবহু পুনরুক্ত হয়েছে। এই পুনরুক্তি থেকে মনে হয় এই মনোভাবই তৎকালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং জনসমাজে মুখে মুখে সুপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। গীতাসংকলনকালে তাই এটি একাধিক স্থলে গৃহীত হয়েছে। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

১ *Ancient Indian History and Civilization* পৃ ২২৮-২৯।

২ ডক্টর রায়চৌধুরী-প্রণীত *Early History of the Vaishnava Sect* ২য় সং পৃ ৮৭; পূর্বাশা ১৩৫৩ বৈশাখ পৃ ৩-৭।

(১৮।৬৬), এই উক্তিটিকে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামিং, ধর্মং শরণং গচ্ছামি" এই দুটি বৌদ্ধ মন্ত্রের প্রত্যুত্তর বলে ধরা যেতে পারে। 'শরণং ব্রজ' এই কথাদুটিই যেন ইঙ্গিতে সমস্ত বাক্যটির গূঢ়ার্থকে সুস্পষ্ট করে তুলছে। সে অর্থটি এই যে বুদ্ধপ্রচারিত 'ধর্ম' অবশ্যপরিত্যাজ্য এবং 'বুদ্ধে'র পরিবর্তে বাসুদেবের 'শরণ' গ্রহণই মোক্ষার্থীর পক্ষে অধিকতর ও আশু ফলপ্রদ। এই ব্যাখ্যা একেবারে অসম্ভব নয়। 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ' (২।৪৯) এই উক্তিটিতেও হয়তো 'বুদ্ধশরণ' মন্ত্রের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। গীতাতে কর্মের উপর যে জোর দেওয়া হয়েছে এবং সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ আছে তাতেই সংঘশরণের তথা ভিক্ষুব্রতের নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। তাছাড়া অর্জুনের বিষাদ ও যুদ্ধবিমুখতাকে উপলক্ষ্য করে কলিঙ্গবিজয়ের পর অশোকের যুদ্ধত্যাগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে কিনা বলা শক্ত। যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে 'তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়', 'ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি' (২।৩৭, ৩৮) ইত্যাদি গীতোক্তিতে বৌদ্ধ সমরবিমুখতার বিরুদ্ধে বর্ণাশ্রমমূলক ব্রাহ্মণ্যসমাজের প্রতিবাদই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। 'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ' ইত্যাদি শ্লোকের 'ধর্ম' শব্দটিকে যদি তার প্রচলিত অর্থাৎ টীকাকারস্বীকৃত অর্থে গ্রহণ করা যায় তাহলেও যুদ্ধবিমুখ ক্ষত্রিয় রাজা অশোক যে বর্ণাশ্রম ধর্মের দৃষ্টিতে স্বধর্মত্যাগী রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কেননা যুদ্ধ করা ক্ষাত্রধর্মও বটে, রাজধর্মও বটে। তাছাড়া তৎকালে যেসমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা অকালেই ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করত তারাও যে স্বধর্মত্যাগী ও বর্ণাশ্রমধর্মের বিরোধী বলে গণ্য হত তাতে সন্দেহ নেই। এই

ভিক্ষুব্রতগ্রহণোন্মুখদের উদ্দেশ্যেই 'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। নতুবা ঐ শ্লোকটির উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কি হতে পারে? অর্জুনকে উপলক্ষ্যমাত্র করে গীতা জনসাধারণের জন্যই রচিত হয়েছিল এ বিষয়ে তো কোনো সংশয় করা চলে না। বহু লোক দলে দলে বৌদ্ধসংঘে যোগ দিতে শুরু করাতে বর্ণাশ্রমমূলক সমাজে যে ক্ষয় দেখা দিল, সে ক্ষয় রোধ করার প্রয়োজনবোধেই উক্তপ্রকার বহু শ্লোক রচিত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

এসব অনুমানের মূল্য যাই হোক না কেন, অর্থাৎ গীতায় বৌদ্ধ-ধর্মের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন কোনো উক্তি থাকুক বা না থাকুক, একথা সত্য যে গীতায় ধর্ম- ও দর্শন-বিষয়ক বহু মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস থাকলেও ও-গ্রন্থে বৌদ্ধ (তথা জৈন, আজীবিক প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য ও অবৈদিক) ধর্মমতকে উপেক্ষাই করা হয়েছে। টীকাকাররাও গীতোক্ত সাধনমার্গগুলির মধ্যে বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক মার্গের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। পরবর্তী কালে মৎস্যপুরাণ, ভাগবতপুরাণ গীতগোবিন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলেই স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু গীতায় বৌদ্ধদের সম্বন্ধে কোনো প্রকার অনুকূল মনোভাব প্রকাশ পায়নি।

৮

পূর্বেই বলেছি অশোক নিজে নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ হলেও স্বদেশে কিংবা বিদেশে উক্ত ধর্ম প্রচার করেছিলেন একথা মনে করার পক্ষে কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। সর্বধর্মের সারবস্তুস্বরূপ

কতকগুলি চারিত্রনীতিকেই তিনি 'ধর্ম' নামে অভিহিত করেছিলেন এবং সর্বসাধারণের পক্ষে এই মৌলিক ধর্ম পালনের উপযোগিতার উপরেই তিনি জোর দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি অপক্ষপাতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করতেন একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত পারস্পরিক সমবায়ের দ্বারা তিনি সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ডক্টর রায়চৌধুরীর ভাষায় বলা যায়, He preached the virtues of concord and toleration in an age when *religious feeling ran high.*[১]

শুধু তাই নয়, তিনি নিজে ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং জনসাধারণকেও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হতে উপদেশ দিতেন। নানা উপলক্ষ্যে তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করতেন এবং প্রজাগণকেও এভাবে দান করতে উৎসাহিত করতেন। কেননা তাঁর মতে ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করা এবং দান করা ধর্মেরই অঙ্গ। এসব কথা তাঁর শিলালিপিগুলি থেকেই নিঃসন্দেহরূপে জানা যায়। কিন্তু তথাপি তিনি ব্রাহ্মণদের প্রসন্নতা অর্জন করতে পারেননি। বরং তাঁদের কাছে তিনি শূদ্রপ্রায়, অধার্মিক, বৃষল, অসুর, পাষণ্ডী, মূর্খ, মোহাত্মা বলেই গণ্য হয়েছিলেন, তা আমরা পূর্বে দেখিয়েছি।

আধুনিক কালে অশোককে যে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হয়, তৎকালীন ব্রাহ্মণরা তাঁকে সে দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি। সেজন্যই ব্রাহ্মণ্যসাহিত্য তাঁর সম্বন্ধে এত নীরব বা প্রতিকূল এবং

---

১ *Political History of Ancient India* ৪র্থ সং পৃ ২৮৭।

সেজন্যই ভারতীয় জনস্মৃতিতেও তাঁর কোনো স্থান হয়নি। বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। বর্তমান সময়ে দেশে বিদেশে সকলেই স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান হচ্ছেন বুদ্ধদেব। কিন্তু তৎকালীন ব্রাহ্মণরা তাঁর প্রতি কতখানি বিরূপ ছিলেন তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তার ফলে ভারতবর্ষের জনচিত্ত থেকে বুদ্ধদেবের স্মৃতিও প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

৯

এখন প্রশ্ন হচ্ছে অশোক সম্বন্ধে তৎকালীন ব্রাহ্মণদের এই যে অপ্রসন্নতা ও বিরুদ্ধতা, তার কারণ কি। প্রথমেই বলা উচিত যে এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ কোনো স্পষ্ট উক্তি প্রাচীন সাহিত্যে বা অন্য কোথাও নেই। এর থেকে মনে হয় ব্রাহ্মণদের এই বিরুদ্ধতা সম্ভবত স্পষ্ট প্রতিবাদের আকার ধারণ করেনি, নতুবা সংস্কৃত সাহিত্য অশোকের নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠত। উক্ত ব্রাহ্মণ্য বিরুদ্ধতা প্রধানত নীরব অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার আকারেই আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে মনে হয়। সেজন্যই ওই বিরুদ্ধতার কারণ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট বিবৃতি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তথাপি ওই কারণ অতি সহজেই অনুমান করা যায়। যেমন—

প্রথমত, অশোক ছিলেন স্বধর্মত্যাগী; বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধদের প্রতি বিরাগও ছিল ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বাভাবিক। অশোকের বৌদ্ধত্ব যদি বংশানুগত হত তাহলেও সেটা তত গুরুতর হত না। কিন্তু কিছুকাল রাজত্ব করার পর তিনি নিজে পূর্বধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ

হয়েছিলেন, ব্রাহ্মণের চোখে এ অপরাধ সত্যই গুরুতর। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ অনুসারে যে নৃপতি বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্মের আশ্রয়স্থল তিনিই যথার্থ রাজা এবং যিনি সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন তিনি 'বৃষল'। এই হিসাবে অশোকও ছিলেন বৃষল। ব্রাহ্মণদের মতে বেদই সমস্ত ধর্মের মূল এবং যারা শ্রুতিস্মৃতিবাহ্যব্রতধারী তারা পাষণ্ডী। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিচারে অশোক ছিলেন অধার্মিক পাষণ্ডী। বৌদ্ধরা দেবপূজার সমর্থক ছিলেন না এবং অশোক যদিও তাঁর পূর্বগৃহীত 'দেবানং পিয়' উপাধি ত্যাগ করেননি, তথাপি তাঁর শিলালিপিতে কোথাও দেবপূজার সার্থকতা (তথা ঈশ্বরের অস্তিত্ব) স্বীকৃত হয়নি। সুতরাং দেবহীন ধর্মের সমর্থক হিসাবে তাদের চোখে তিনি ছিলেন সুরদ্বিষ্‌ বা অসুর এবং নাস্তিক। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ সম্বন্ধে পূর্বোদ্ধৃত রামায়ণের শ্লোকটি স্মরণীয় (পৃ ৮৫)।

দ্বিতীয়ত, অশোক পুনঃপুন যে ধর্মের মহিমা কীর্তন করেছেন সে ধর্ম হচ্ছে আসলে কতকগুলি চারিত্রনীতিমূলক, ব্রাহ্মণানুমোদিত আচার বা অনুষ্ঠানমূলক নয়। অশোকের শিলালিপিতেও অনুষ্ঠানাদি উপেক্ষিতই হয়েছে। বরং কতকগুলি 'মংগল' অর্থাৎ অনুষ্ঠানকে তিনি 'নিরর্থক' বোধে স্পষ্টভাবেই নিন্দা করেছেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন তা আন্তরিক হলেও আনুষ্ঠানিক ছিল না। কেননা বৌদ্ধ বলেই কোনো প্রকার ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের সহায়তা গ্রহণ তাঁর পক্ষে অনাবশ্যক ছিল। মনুসংহিতার 'ক্রিয়ালোপ'- এবং 'ব্রাহ্মণাদর্শন'-বশত ক্ষত্রিয়ের বৃষলত্বপ্রাপ্তির কথা স্মরণীয়। বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে সব চেয়ে প্রধান হচ্ছে যজ্ঞানুষ্ঠান। বৌদ্ধ হিসাবে অশোক স্বভাবতই যাগযজ্ঞের বিরোধী ছিলেন। তবে সে বিরোধিতা তিনি কোথাও

স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেননি, কিংবা প্রজাগণকে যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে নিবৃত্ত হতেও বলেননি। কিন্তু যজ্ঞোপলক্ষ্যে পশুহত্যা সম্বন্ধে তাঁর বিরুদ্ধ অভিমত তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এবং প্রজাগণকে এ বিষয়ে নিরস্ত হতে বাধ্য না করলেও যজ্ঞে প্রাণিহত্যা না করা যে ভালো এ সম্বন্ধে তিনি তাদের পুনঃপুন উপদেশ দিয়েছেন। এ উপদেশ যে প্রত্যক্ষত ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পশুবধ না করলে যজ্ঞই অসিদ্ধ হয়, অথচ যজ্ঞই বৈদিক ধর্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গ এবং ব্রাহ্মণগণের অন্যতম প্রধান কৃত্য। সুতরাং অশোকের উক্তপ্রকার উপদেশের ফলে বৈদিক ধর্মলোপ তথা নিজের অধিকার, প্রভাব ও স্বার্থ লোপের আশঙ্কায় ব্রাহ্মণদের আতঙ্কিত হবার যথার্থ কারণ ছিল। দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব একটিমাত্র বাক্যে বুদ্ধচরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। সে বাক্যটি হচ্ছে এই—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।

এই উক্তিটি অশোক সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। এর দ্বারা অশোকচরিত্রের মহত্ত্ব ('সর্বভূতের নিকট আনৃণ্য' লাভ ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম মহৎ উদ্দেশ্য) যতই প্রমাণিত হোক, এই পশুঘাত-মূলক শ্রৌত যজ্ঞবিধির নিন্দা দ্বারা তিনি যে ব্রাহ্মণদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

একথা বলা যেতে পারে যে—অশোকের বহু পূর্বেই মুণ্ডক উপনিষদে অতি কঠোর ভাষায় যজ্ঞনিন্দা করা হয়েছে, ছান্দোগ্য উপনিষদেও অহিংসার মহিমাপ্রচার এবং বৈদিক বিধিযজ্ঞ বর্জন করে তৎস্থলে চারিত্রনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা যায়,

এমন কি গীতাতেও দ্রব্যযজ্ঞের পরিবর্তে জ্ঞানযজ্ঞের বিধান এবং বেদের নিন্দা দেখা যায়, তাতে ব্রাহ্মণরা বিচলিত হননি, সুতরাং অশোকের যজ্ঞার্থ প্রাণিবধবিরোধী উক্তিতেও তাঁদের উত্তেজিত হবার কোনো কারণ দেখা যায় না। এর উত্তর এই যে ব্যক্তিগত ভাবে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বই লিখে (বা মৌখিক ভাবে) বেদ- বা যজ্ঞ-বিরোধী মত প্রচার এবং অশোকের ন্যায় ক্ষমতাশালী ও প্রায় সমগ্র ভারতের অধীশ্বরের পক্ষে (বিশেষত তিনি যদি বেদধর্মবিরোধী বৌদ্ধ হন) রাজাসন থেকে যজ্ঞে প্রাণিহত্যার অনৌচিত্য প্রচার করা এক কথা নয়। অশোকের প্রথম গিরিলিপির একেবারে গোড়াতেই স্পষ্ট বলা হয়েছে 'ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজুহিতয্ৰং'—এখানে (অর্থাৎ এই রাজ্যে) কোনো জীবকে হত্যা করে (যজ্ঞে) আহুতি দেবে না। এই উক্তিতে ক্ষমতাশালী সম্রাটের কণ্ঠে তাঁর আদেশবাক্যই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এরকম দৃঢ় রাজাজ্ঞায় ব্রাহ্মণদের মনে যদি আতঙ্ক দেখা দিয়ে থাকে সেটা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। এই উক্তির সঙ্গে উপনিষদ্ বা গীতার যজ্ঞনিন্দার তুলনাই হয় না।

বলা প্রয়োজন যে পূর্বোক্ত ইধ (এখানে) শব্দটিকে আমি 'এই রাজ্যে' অর্থে গ্রহণ করেছি; কেউ কেউ 'পাটলিপুত্রে' বা 'রাজপ্রাসাদে' অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় অর্থ মেনে নিলেও এই অনুশাসনের গুরুত্ব কমে না। অশোক প্রজাদের অবগতি ও অনুসরণের জন্য এই অনুশাসনটিকে স্বীয় সাম্রাজ্যের সর্বত্রই প্রচার করেছিলেন। তাছাড়া অন্যান্য অনুশাসনেও তিনি যজ্ঞে প্রাণিহত্যার অসাধুত্বের কথা (প্রাণানং সাধু অনারংভো) পুনঃপুন প্রচার করেছেন। সুতরাং রাজার আদর্শ কি এবং তাঁর

অভিপ্রায়ই বা কি সে বিষয়ে প্রজাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। আর, এই অনুশাসন যে রাজার সাধু ইচ্ছা বা মুখের কথামাত্রই থেকে যায়নি, পরন্তু প্রজাদের দ্বারা বহুলপরিমাণে অনুসৃতও হত, তার প্রমাণ আছে অশোকের লিপিতেই। চতুর্থ গিরিলিপিতে অশোক পরম সন্তোষসহকারে জানাচ্ছেন যে বহুকাল যা হয়নি তাঁর ধর্মানুশাসনের ফলে তাই হয়েছে, (প্রজাদের মধ্যে) যজ্ঞে প্রাণিবধ থেকে বিরত থাকা (অনারংভো প্রাণানং) প্রভৃতি বহুবিধ ধর্মাচরণ খুবই বেড়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে যাতে আরও বেড়ে যায় তা তিনি করবেন।

সুতরাং একথা অস্বীকার করা যায় না যে অশোক যে-ভাবে যজ্ঞে প্রাণিবধের অপ্রশংসা ও অনৌচিত্যপ্রচার করেছেন প্রজাগণেব পক্ষে তা কার্যত নিষেধমূলক রাজাজ্ঞার তুল্যই হয়েছিল। সুতরাং এরকম অনুশাসনকে ব্রাহ্মণরা স্বভাবতই বৈদিক যজ্ঞমূলক ধর্মানুষ্ঠানেব বিরুদ্ধাচরণ এবং ব্রাহ্মণের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলেই গণ্য করেছিলেন একথা মনে করা অসংগত নয়। ব্রাহ্মণদের বিচারে আদর্শ রাজা হবেন যজ্ঞাদি বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের তথা বর্ণাশ্রমধর্মেব প্রধান ধারক, বাহক ও পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু অশোকের কাছে তাঁরা তাব বিপরীত আচরণই লাভ করেছিলেন।

তাছাড়া ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুসারে দেশেব ধর্মরক্ষা ও ধর্মানুশাসনের ভার থাকবে ব্রাহ্মণেরই উপর, রাজা ওই অনুশাসন-অনুযায়ী ব্যবস্থা করবেন মাত্র। কিন্তু অশোক দেশের ধর্মানুশাসন ও তার ব্যবস্থাপন, এই উভয় দায়িত্বই নিজে গ্রহণ করলেন এবং নিজের সহায়রূপে ধর্মমহামাত্র, রাজুক প্রভৃতি রাজপুরুষ নিযুক্ত করলেন, অর্থাৎ তিনি নিজে রাজ্যের সর্বত্র ধর্মানুশাসন প্রচার করলেন এবং সেগুলিকে

কার্যে পরিণত করার ভার দিলেন ধর্মমহামাত্রাদির উপর। য়ুরোপীয় ইতিহাসের পরিভাষায় বলা যায় তিনি এম্পারার ও পোপের অধিকারকে নিজের মধ্যে সংহত করলেন। এটাও খুব সম্ভবত পোপের স্থলবর্তী ব্রাহ্মণদের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলেই গণ্য হয়েছিল। হয়তো এজন্যই ধর্মবিজয়ের স্থাপয়িতা হিসাবে তাঁকে 'মোহাত্মা' বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

একদিকে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা হরণ এবং অপরদিকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এটা অবশ্যই তাঁদের কাছে প্রীতিকর হয়নি। এই ক্ষমতা হরণের আরও কয়েকটি দিক্ আছে। আমরা দেখেছি অশোক সর্বসম্প্রদায়কে সমভাবে শ্রদ্ধা ও সাহায্য করতেন, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেননি। কিন্তু তৎকালে দেশে ব্রাহ্মণ্যসমাজের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য ছিল; বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়-গুলির প্রভাব খুব কমই ছিল। কিন্তু অশোকের অপক্ষপাত নীতির ফলে ওই সম্প্রদায়গুলি এক হিসাবে ব্রাহ্মণ্যসমাজের সমকক্ষতা লাভ করল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা তাঁদের চিরাগত প্রাধান্য থেকে বঞ্চিত হল। অশোকের লিপিগুলিতে সর্বত্রই ব্রাহ্মণের সঙ্গে শ্রমণের উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণকে তিনি সমভাবে শ্রদ্ধা ও সাহায্য করতেন, জনসাধারণকেও তিনি তাঁদের প্রতি সমভাবে দানাদির দ্বারা শ্রদ্ধা দেখাতে উপদেশ দিয়েছেন। অশোকের এই সমদৃষ্টিও ব্রাহ্মণদের পক্ষে সম্ভবত প্রীতিজনক হয়নি। কেননা তাঁরা কখনও শ্রমণদের সমকক্ষতা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

তাছাড়া অশোক সকলকেই পুনঃপুন স্বসম্প্রদায়ের পূজা ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা থেকে বিরত হতে উপদেশ দিয়েছেন। এই উপদেশের দ্বারা বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক ধর্মসম্প্রদায়ের সুবিধা এবং

ব্রাহ্মণ্যসমাজের অসুবিধাই হয়েছিল মনে হয়। কেননা অবৈদিক সম্প্রদায়গুলি যখন ব্রাহ্মণ্যসমাজের ক্ষয়সাধন করছিল তখন ওগুলিব তীব্র নিন্দার দ্বারাই ব্রাহ্মণ্যসমাজ আত্মরক্ষা করছিল। এই নিন্দার অধিকার তাঁদের কাছে আত্মরক্ষারই অধিকার। কেননা এই নিন্দার দ্বারা তাঁরা বিরুদ্ধ সম্প্রদায়গুলিকে অভিভূত করে রাখছিলেন। অশোকের এই অনুশাসনের দ্বারা অবৈদিক সম্প্রদায়গুলি সংখ্যাধিক ব্রাহ্মণ্যসমাজের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেল এবং ব্রাহ্মণ্যসমাজ তীব্র আক্রমণের দ্বারা তাদের পরাভূত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল।

অশোক পুনঃপুন ধর্মসমবায় (অর্থাৎ ধর্মসম্মেলন) ও পরধর্মশুশ্রূষাব প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি ও তাঁর ধর্মমহামাত্ররা বহু ধর্ম সমবায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে মনে হয। এই সমবায়-গুলিতে সকলেই পরস্পবেব ধর্মমত শ্রবণ কবে পবস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হবে, এই ছিল অশোকের অভিপ্রায। কিন্তু এখানেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির স্বধর্মপ্রচারের সুযোগই হযেছিল মনে কবা যায়। পক্ষান্তবে যে পাষণ্ডীদের বাঙ্‌মাত্রের দ্বাবা সংবর্ধনা করাও ব্রাহ্মণরা সংগত মনে করতেন না তাঁদের সমক্ষে উপস্থিত হয়ে তাঁদেরই ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করা ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিশ্চয়ই একান্ত অপমানজনক বলে গণ্য হয়েছিল। সনাতনীদের পক্ষে hereticদের ধর্মমত শোনা সব দেশে এবং সব কালেই অপ্রীতিকর।

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় প্রাকৃত ভাষাকেই তাদের ধর্মগ্রন্থ ও প্রচারের বাহন বলে গ্রহণ করেছিল। ব্রাহ্মণরা কিন্তু কোনোকালেই প্রাকৃত ভাষাকে ধর্মসাহিত্যের ভাষা বলে স্বীকার করেননি, এমন কি রসসাহিত্যের যোগ্য বাহন বলেও মনে করতেন না (অনেক পরবর্তী কালে অবশ্য প্রাকৃতকে রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে সামান্য

একটু স্থান দেওয়া হয়েছিল)। অশোক কিন্তু বৌদ্ধপ্রথা অনুসারে তাঁর ধর্মলিপিগুলিতে প্রাকৃতই ব্যবহার করেছেন। রাজকার্যও ওই প্রাকৃত ভাষার যোগেই সম্পাদিত হত। সংস্কৃতকে পরিহার করে প্রাকৃতকে ওরকম প্রাধান্য দান ব্রাহ্মণদের অনুমোদন লাভ করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। কেননা পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের পুনরভ্যুত্থানের যুগে সংস্কৃতই ধর্মসাহিত্য তথা রাজানুশাসনের বাহন বলে স্বীকৃত হয়। এ বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এস্থলে আমাদের পক্ষে তা অপ্রাসঙ্গিক।

১০

আমরা দেখলাম অশোক ও তাঁর ধর্মনীতির উপর ব্রাহ্মণরা প্রসন্ন ছিলেন না এবং সে অপ্রসন্নতার যথেষ্ট উপলক্ষ্যও ছিল। কিন্তু তাঁদের এই অপ্রসন্নতা ও বিরুদ্ধতা খুব সম্ভব অল্পবিস্তর নীরব অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার আকারেই ধূমায়িত হচ্ছিল, কখনও তীব্র প্রতিবাদে মুখর কিংবা প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকারে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু মৌর্যসাম্রাজ্যের স্থিতির পক্ষে ওই নীরব অসন্তোষই যথেষ্ট অকল্যাণকর ছিল। অশোকের লিপি থেকেই বোঝা যায় তৎকালে দেশে ব্রাহ্মণের মর্যাদা এবং প্রভাবপ্রতিপত্তিও খুব বেশি ছিল। সে সময়ে দেশের অধিকাংশ লোকই ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সংখ্যাশক্তিতে এই সম্প্রদায়ের তুলনায় বৌদ্ধ প্রভৃতি সংস্কারপন্থীরা ছিল নগণ্য। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণদের অসন্তোষ সাম্রাজ্যের কল্যাণ ও স্থায়িত্বের পক্ষে উপেক্ষণীয় ছিল না। এইজন্যই দেখি অশোক তাঁদের সন্তোষ অর্জনের জন্য খুবই সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের প্রসন্নতার অধিকারী হতে পারেননি। কেননা ধর্মে

ও সমাজে তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার না করে তাঁদের সন্তোষলাভ করা সম্ভব ছিল না। তাই সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধতার ফল মৌর্যসাম্রাজ্যের পক্ষে অশুভই হয়েছিল।

একথা বলা বাহুল্য যে, যে-সাম্রাজ্য প্রজাসাধারণের অধিকাংশের সদিচ্ছা ও আনুগত্যের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সে সাম্রাজ্য যতই সুশাসিত এবং শক্তি ঐশ্বর্য ও অন্যান্য বিষয়ে যতই গৌরব ও প্রশংসার বিষয় হোক না কেন, তার পক্ষে কখনও দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়, অচিরকালের মধ্যে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে কোনো সাম্রাজ্য যদি জনসাধারণের আন্তরিক প্রীতি ও সন্তোষলাভে সমর্থ হয় তাহলে সে সাম্রাজ্য সাময়িক কুশাসন বা রাজাবিশেষের উৎপীড়ন প্রভৃতি নানারকম অগভীর বা সামান্য প্রতিকূল কারণ সত্ত্বেও বহুদিন স্থায়ী হয়ে থাকে। অশোকের প্রজাবাৎসল্য, সুশাসন, রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের অক্লান্ত প্রয়াস, এসমস্তই সুবিদিত। তৎসত্ত্বেও যে মৌর্যসাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এবং বৈদেশিক আক্রমণের পূর্বেই ভেঙে গেল তার অন্যতম প্রধান কারণ ব্রাহ্মণচালিত সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের অসন্তোষ, এবিষয়ে বোধ করি সন্দেহ করা চলে না।

অশোকের ব্যক্তিগত আদর্শ ও তাঁর অনুসৃত ধর্মনীতির ফলে বৌদ্ধধর্ম মর্যাদায় ও প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমকক্ষতা লাভ করে এবং মৌর্যসাম্রাজ্যের বাইরে একদিকে চোল, চের, পাণ্ড্য ও তাম্রপর্ণী (সিংহল), অপরদিকে পারস্য, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশে এবং পরবর্তী কালে প্রায় সমগ্র পূর্বএশিয়ায় প্রসার লাভ করে। সম্ভবত অশোকের আদর্শ ও অনুপ্রাণনার ফলেই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে নিরামিষ খাদ্যের প্রচলন হয়। এ সমস্তই অশোকের ধর্মনীতির পরোক্ষ ও ব্যবহিত ফল। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত ফল খুবই অশুভ হয়েছিল।

অশোকের যুদ্ধবিমুখতার ফলে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি হ্রাস এবং তাঁর ধর্মনীতির প্রতি ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধতা, প্রধানত এই দুই কারণেই মৌর্যসাম্রাজ্যের ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে যায়। এইজন্যই অশোকের মৃত্যুর পর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই পুষ্যমিত্র শুঙ্গ যখন মগধের সিংহাসন অধিকার করেন তখন তাঁকে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করতে হয়েছিল বলে মনে হয় না। মৌর্যসাম্রাজ্যের পক্ষ অবলম্বন করে পুষ্যমিত্রকে বাধা দেবার ইচ্ছা বা সাহসও কারও ছিল বলে মনে হয় না। বৌদ্ধদের মনোভাব যাই হোক, মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনে ব্রাহ্মণ্যসমাজের হৃদয় থেকে একটি দীর্ঘনিশ্বাসও উত্থিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। পক্ষান্তরে পুষ্যমিত্রের রাজ্যাধিকারে ব্রাহ্মণদের আন্তরিক সমর্থন ছিল বলেই মনে হয়। অশ্বমেধের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা বলে ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে পুষ্যমিত্রের সপ্রশংস উল্লেখ দেখা যায়। কেননা অশ্বমেধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মানেই হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। হরিবংশে বলা হয়েছে, "সেনানীঃ কাশ্যপো দ্বিজঃ অশ্বমেধং কলিযুগে পুনঃ প্রত্যাহরিষ্যতি"। এখানে 'দ্বিজ' শব্দের উল্লেখ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। যাহোক, পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে একটিমাত্র নয়, দুটি অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অশোক বলেছিলেন "ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজুহিতয়ং"। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে এবং সম্ভবত তাঁর প্রসাদসীমার মধ্যেই মহাসমারোহে দুটি অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হল— এটা যুগপৎ অশোকের যজ্ঞবিমুখ ধর্মনীতি এবং যুদ্ধবিমুখ রাজনীতির ব্যর্থতা ও প্রতিক্রিয়ারই প্রত্যক্ষ ফল। অশ্বমেধ শত্রুবিজয়েরই প্রতীক এবং সম্ভবত যবনবিজয়ের নিদর্শন হিসাবেই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়েছিল। যবনবিরোধী সংগ্রাম ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের এই যে সংযোগ দেখা যাচ্ছে এটা নেহাত আকস্মিক ব্যাপার বলেই মনে হয় না।

ভারতবর্ষের বাইরেও অশোকের ধর্মনীতি প্রত্যক্ষত ব্যর্থ ও অশুভ-ফলপ্রসূই হয়েছিল। যবনমণ্ডলে (অর্থাৎ সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি গ্রীকরাজ্যে) তিনি ধর্মবিজয় ও মৈত্রীর বাণী এবং যুদ্ধবিগ্রহের ব্যর্থতার কথা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এই প্রেম ও মৈত্রীর বাণী যবন বিজিগীষুদের হৃদয় স্পর্শ করেনি। তার ফল এই হল যে মৌর্যসাম্রাজ্য যখন পতনোন্মুখ ঠিক সেই সময়ে মধ্যএশিয়ার দুষ্টবিক্রান্ত, যুদ্ধদুর্মদ ও যুগদোষদুরাচার যবনগণ অশোকের মৈত্রী- ও ধর্মবিজয়-বাণীর প্রতিদানস্বরূপ বৈরিতা ও অস্ত্রবিজয়ের উন্মাদনায় দুর্নিবার বেগে ভারতবর্ষের উপর আপতিত হল এবং মধ্যমিকা (চিতোরের নিকটে), মথুরা, পঞ্চাল (রোহিলখণ্ড), সাকেত (অযোধ্যা), এমন কি রাজধানী পাটলিপুত্র পর্যন্ত আক্রমণ করে সমস্ত ভারতবর্ষকে বিপর্যস্ত করে তুলল।

সুতরাং দেখা গেল রাজনীতির দিক্ থেকে অশোকের ধর্মবিজয়ের আদর্শ দেশে ও বিদেশে সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হয়েছিল। বিদেশে তিনি রাজ্যলিপ্স যবনদের চিত্ত মৈত্রীর বাণীতে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেননি, ফলে তাদের আক্রমণে রাজধানীসহ সমস্ত সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত হল। দেশে তাঁর ধর্মবিজয়ের নীতি ব্রাহ্মণদের চিত্ত স্পর্শ করা দূরে থাক, তাদের বিরুদ্ধতাকেই উদ্দীপ্ত করে তুলল। ফলে তিনি তাঁদের কাছে 'মোহাত্মা' ও 'ধর্মবাদী অধার্মিক' বলেই গণ্য হলেন এবং অবশেষে তাঁর ধর্মবিজয়ের মহৎ আদর্শ রাজধানী পাটলিপুত্রেই দুটি অশ্বমেধের যজ্ঞভস্মের মধ্যে পর্যবসিত হল।

মৌর্যসাম্রাজ্যের এই পতন ভারতবর্ষের ইতিহাসের শোচনীয়তম ঘটনা একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। কলিঙ্গবিজয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল, কেবল দক্ষিণতম প্রান্তে কয়েকটি মাত্র ছোটো ছোটো জনপদ সমগ্র ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্রের গণ্ডির বাইরে ছিল। অশোকের ধর্মনীতিপ্রসূত যুদ্ধবিমুখতার ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়

ঐক্য সম্পূর্ণ হবার সুযোগ আর হল না। তথাপি তিনি এক ধর্মের আদর্শ, এক ভাষা ও এক শাসননীতির দ্বারা সমগ্র দেশকে যে ঐক্য দান করেছিলেন তা অতুলনীয়। অশোকের পূর্বে ও পরে আর কখনও ভারতবর্ষ এতখানি ঐক্য লাভ করেনি। তাছাড়া শান্তি শৃঙ্খলা শিল্প ঐশ্বর্য ও বৈদেশিকগণের শ্রদ্ধার্জনে অশোকের সাম্রাজ্য যে উত্তুঙ্গ সীমায় পৌঁছেছিল তাঁর পরবর্তী প্রায় আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসেও ভারতবর্ষ আর কখনও সে সীমায় পৌঁছতে পারেনি। মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন ও তৎকালীন বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের ক্রমঅভিব্যক্তির অব্যাহত ধারা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়ে গিয়ে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ও অশান্তি দেখা দিল তার জন্যে ভারতবাসীকে যে বহুকাল অশেষ দুঃখভোগ করতে হয়েছিল শুধু তা নয়। গভীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে তার পরোক্ষ অশুভ ফল আজও আমাদের ভাগ্যকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করছে।

১১

পরিশেষে পরবর্তী কালের কয়েকটি ঐতিহাসিক বিষয়ের সঙ্গে অশোকের আশ্রিত ধর্মনীতি ও তার ফলাফলের তুলনা করেই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

রাজার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের প্রতিকূলতার কথা অশোকের পরবর্তী ইতিহাসেও অজ্ঞাত নয়। হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মরাঠাশক্তির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীকেও ব্রাহ্মণদের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্যার যদুনাথ সরকার-প্রণীত ‘শিবাজী’ নামক ইংরেজি গ্রন্থের নবম ও ষোড়শ অধ্যায়ে তার বিস্তৃত বর্ণনা

আছে। শিবাজী ক্ষত্রিয় ছিলেন না বলে ব্রাহ্মণরা তাঁর রাজ্যাভিষেককালে যে প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা করেছিলেন তা এস্থলে বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্যার যদুনাথ লিখেছেন, There was a mutiny among the assembled Brahmans who asserted that there was no true Kshatriya in the modern age and that the Brahmans were the only twiceborn living. অন্যত্র তিনি বলেছেন, Shivaji keenly felt his humiliation at the hands of the Brahmans to whose defence and prosperity he had devoted his life. এই উক্তি অশোকের প্রতিও প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য। শিবাজী সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের "insistence on treating him as a Sudra" পুরাণে মৌর্যবংশকে শূদ্র বা শূদ্রপ্রায় বলে বর্ণনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মৌর্যসাম্রাজ্যে শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজাদের আধিপত্যস্থাপনের প্রসঙ্গে ভোঁসলারাজ্যে ব্রাহ্মণ পেশোয়াদের প্রাধান্যলাভের কথাও স্মরণীয়।

পূর্বে অশোকের ধর্মনীতির সঙ্গে আকবরের ধর্মনীতির আশ্চর্য সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে। এখানে ওবিষয়ে আরও দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। আকবরের সর্বধর্মসহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের নীতি যতই উদারতা বিজ্ঞতা ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক হোক না কেন, ওই নীতির দ্বারা তিনি সকলের সন্তোষভাজন হতে পারেননি। গোঁড়া মুসলমানগণের প্রসন্নতা অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁরা তাঁর উপর কিরূপ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় বদাউনীর ইতিহাসগ্রন্থে। আকবর একমাত্র কোরানকেই প্রামাণ্য বলে গণ্য না করে অন্য ধর্মের প্রতিও যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন সেটা তাঁদের পছন্দ হয়নি। সেজন্যে আকবরকে বিশেষভাবেই গোঁড়া মুসলমানদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। মুসলমানরা তৎকালে সংখ্যা-শক্তিতে হীন হলেও বিজেতৃসম্প্রদায় বলে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠায় তাঁদের

প্রভাব কম ছিল না। কাজেই উক্ত ধর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁদের বিরুদ্ধতাকে উপেক্ষা করা আকবরের পক্ষেও সহজ হয়নি। ফলে আকবরের 'দীন ইলাহি' ধর্ম তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাঁব সুলহ্-ই-কুল্ নীতিও দীর্ঘকাল ফলপ্রসূ হয়নি। শাহজাহানের সময় থেকেই ওই নীতিতে শৈথিল্য দেখা দেয় এবং ঔরঙ্গজীবের সময় তা সম্পূর্ণরূপেই পরিত্যক্ত হয়।

অশোক বেদানুমত ধর্মের অনুসরণ করেননি বলে ব্রাহ্মণগণ তাঁর উপর প্রসন্ন ছিলেন না। আকবরও কোরানসম্মত ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন বলে মুসলমানরা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অশোকের ধর্মনীতি সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের অসন্তোষ এবং আকবরের ধর্মনীতি সম্পর্কে মুসলমানদেব অসন্তোষ, উভয়ের পরিণাম হয়েছিল একই রূপ। এই বিরুদ্ধতার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই রাজানুসৃত উদার ধর্মনীতি কালক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং দেশে দুঃখ ও অশান্তি ঘটেছিল।

অশোক ও আকবরের ধর্মনীতিতে একটি পার্থক্যও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমদৃষ্টির নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে অশোক সংখ্যাগুরু ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন; কিন্তু আকবর প্রভাবশালী মুসলিম সম্প্রদায়ের অসন্তোষ সত্ত্বেও সংখ্যাগুরু হিন্দুসমাজের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে মৌর্যসাম্রাজ্য অশোকের তিরোধানের পর অত্যল্পকালের মধ্যেই বিনষ্ট হয়ে গেল। আর, মোগলসাম্রাজ্য আকবরের পরেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজীব যখন আকবরের নীতি ত্যাগ করে সংখ্যাগুরু হিন্দুসম্প্রদায়ের সদিচ্ছাজাত আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হলেন তখনই সুচিরপ্রতিষ্ঠিত মোগলসাম্রাজ্যের বিনাশের সূচনা হল।

মুখ্য প্রমাণপঞ্জী

অনুশাসনাবলী

১ চারুচন্দ্র বসু ও ললিতমোহন কর, অশোক অনুশাসন ১৯১৫ : মূলপাঠ, সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ, এবং টীকা।

২ রামাবতার শর্মা, **প্রিয়দর্শিপ্রশস্তয়:** ১৯১৫ : মূলপাঠ, এবং সংস্কৃত ও ইংরেজি অনুবাদ।

৩ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, Inscriptions of Asoka (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯২০ : শুধু মূলপাঠ।

৪ গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা ও শ্যামসুন্দরদাস, **অশোক কী ধর্মলিপিয়াঁ** ১৯২৩ : মূলপাঠ, এবং সংস্কৃত ও হিন্দী অনুবাদ।

৫ A. C. Woolner, Asoka Text and Glossary (পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়) দুই খণ্ড ১৯২৪ : মূলপাঠ ও টীকা।

৬ E. Hultzsch, Inscriptions of Asoka (C. I. I. প্রথম খণ্ড) ১৯২৫ : মূলপাঠ, ইংরেজি অনুবাদ ও আলোচনা।

৭ বেণীমাধব বড়ুয়া, Inscriptions of Asoka (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৩ : ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অশোকবিষয়ক গ্রন্থ

ইংরেজি

১ V. A. Smith, Asoka (Rulers of India Series) ১৯০১, দ্বিতীয় সং ১৯০৯, তৃতীয় সং ১৯২০।

২ J. M. Macphail, Asoka (Heritage of India Series) ১৯১৫, দ্বিতীয় সং ১৯২৬, তৃতীয় সং ১৯২৮।

৩ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, Asoka (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯২৫, দ্বিতীয় সং ১৯৩২।

৪ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, Asoka (Gaekwad Lectures)।

৫ বেণীমাধব বড়ুয়া, Asoka and His Inscriptions ১৯৪৬।

বাংলা

১ কৃষ্ণবিহারী সেন, অশোকচরিত ১৮৯২, তৃতীয় সং ১৯১০।

২ চারুচন্দ্র বসু, অশোক বা প্রিয়দর্শী ১৯১১।

৩ সুরেন্দ্রনাথ সেন, অশোক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৪০।

ইতিহাসগ্রন্থে অশোকবিষয়ক অধ্যায়

ইংরেজি

১ রমেশচন্দ্র দত্ত, History of Civilisation in Ancient India ১৮৮৮-৯০, দ্বিতীয় সং ১৮৯৩, ১৯০৮ সং দ্বিতীয় খণ্ড: অধ্যায় ৭।

২ T. W. Rhys Davids, Buddhist India (Story of Nations Series) ১৯০৩ : অধ্যায় ১৫।

৩ V. A. Smith, Early History of India ১৯০৪, দ্বিতীয় সং ১৯০৮, তৃতীয় সং ১৯১৪, চতুর্থ সং ১৯২৪ : অধ্যায় ৬-৭।

৪ V. A Smith, Oxford History of India ১৯১৯, দ্বিতীয় সং ১৯২৩ : পৃ ৯৩-১১৬।

৫ F. W. Thomas, Cambridge History of India প্রথম খণ্ড ১৯২২ : অধ্যায় ২০।

৬ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, Political History of Ancient India (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯২৩, দ্বিতীয় সং ১৯২৭, তৃতীয় সং ১৯৩১, চতুর্থ সং ১৯৩৮ : পৃ ২৪৮-২৮৮।

৭ F. J. Monahan, Early History of Bengal ১৯২৫ : অধ্যায় ১৬-১৯।

৮ J. Allan, Cambridge Shorter History of India ১৯৩৪ : অধ্যায় ৪।

৯ নীহাররঞ্জন রায়, Maurya and Sunga Art (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৪৫ : অধ্যায় ১-৮।

অন্যান্য উপাদানের উল্লেখ নির্দেশিকার 'প্রামাণিক' বিভাগে দ্রষ্টব্য।

নির্দেশিকা

ঐতিহাসিক

ভৌগোলিক

প্রামাণিক

পারিভাষিক

বিবিধ

সংশোধন

অভীষ্ট পাঠগুলি পৃষ্ঠা- ও পংক্তি-ক্রমে নিয়ে দেওয়া গেল।

১।৯	আর ইরানে 'জরথুস্ত্র'
১।শেষ	স্বীয় 'বাহুবলে'
৬।১২	'এশিয়া' মাইনর থেকে
৬।১৩	'এনটিগোনসের' ভাগে মাকিদন
৭।শেষ	যবনসাম্রাজ্যের 'পূর্ব' সীমা
১০।৩	খণ্ড ছিন্ন 'বিক্ষিপ্ত'
১৪।১০	দারয়বৌষ্ পুত্র 'খ্ষয়ার্ষা'
১৬।১২	'ভারতবর্ষ' দিয়েছিল
১৬।২০,২৪	'ধম্মপদ'
৩৪।১৮	'উপনিষদের' পুরুষযজ্ঞের
৪৭।শেষ	'বহু যুদ্ধ' বিগ্রহে
৫৬।১০	'য়ুরোপের' ইতিহাসে
৫৬।১৫	'য়ুরোপের' ধর্মদ্বন্দ্বের
৫৯।১৭	'মথুরা' প্রভৃতি স্থানে
৬০।৯	'ব্রাহ্মণ্য' ধর্মের
৬৯।৭	'রাষ্ট্রীয়' ধর্মে
৬৯।১৩	'প্রচারলিপ্সু' বৌদ্ধসম্রাট্
৯১। ফুটনোট	২য় সং 'পৃ ৫-৬'